ব্রহ্মচর্য্য

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

তরুণ সাহিত্য মন্দির
১৬ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা

নিবেদন

মহাত্মা গান্ধী লিখিত Self-Restraint vs. Self-Indulgence নামক ইংরেজী বইএর Towards Moral Bankruptcy ভিন্ন অপর সকল প্রবন্ধের অনুবাদ ইহাতে দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন মহাত্মাজীর অন্য কয়েকটি হিন্দী ও গুজরাতী প্রবন্ধের অনুবাদও এই পুস্তকে আছে। বর্ত্তমান সংস্করণে গান্ধীজীর দু'টি নূতন লেখা দেওয়া গেল।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সকল লেখাই পড়িতে চান, তাঁহারা যেন তরুণ সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত **"দুর্নীতির পথে"** (Towards Moral Bankruptcy) পড়েন। উহাতে 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিস্তৃত আলোচনা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য পণ্ডিতের লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ আছে।

কলিকাতা বিনয়কৃষ্ণ সেন

সূচী

তৃতীয় সংস্করণের প্রস্তাবনা

এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হইল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে আরও দুই একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি পুস্তক প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া তাহা করা গেল না।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক চিঠি নিয়মিতরূপে আমার নিকট আসিতেছে। আমি প্রশ্নকর্ত্তাদিগকে এই কথাগুলি বলিয়া সাবধান করিতেছি:

যাঁহারা আত্ম-সংযমে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহারা যেন বিষণ্ণ না হন। যে-সব চিঠি আমার নিকট আসিতেছে তাহা দেখিয়া বুঝিতেছি, সংযম অভ্যাস করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে অনেকে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অন্যান্য ভাল জিনিষ আয়ত্ত করার ন্যায় সংযম পালন করিতে হইলেও অসীম ধৈর্য্যের দরকার। হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই—ইহা লইয়া উদ্বেগভরে চিন্তা করাও ছাড়িতে হইবে। কুচিন্তা দূর করিবার জন্য ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করিতে হইবে না। এরূপ চেষ্টা করিলেও কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

বাধা না দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়; অর্থাৎ কুচিন্তাকে আমল না দিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য লইয়া সব সময় তাহাতে তন্ময় হইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা করিতে হইলে দেহ-মনকে একাগ্রতার সহিত কাজে লাগাইতে হইবে। হাতে কাজ না থাকিলে, লোকে সব সময় অনিষ্টকর কিছু করিয়া থাকে, এ কথা এক্ষেত্রে যেরূপ খাটে, আর

কোথায়ও এত সুন্দর ভাবে খাটে না। কাজে এরূপে ব্যস্ত থাকিলে কুচিন্তা ও কুকার্য্য করা অসম্ভব। ব্যক্তিগত ও জগতের উন্নতির জন্য সংযম অবশ্য পালনীয়। ইহা লাভের জন্য প্রত্যেকের যথাশক্তি চেষ্টা করা উচিত।

সত্যাগ্রহ আশ্রম, সাবরমতি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তাবনা

সুখের বিষয় প্রথম সংস্করণের বইগুলি এক সপ্তাহের ভিতর ফুরাইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে, অনেকে আমাকে চিঠি দিয়াছিলেন; তাহাতেই মনে হইয়াছিল, এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। যাহারা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকে ধর্ম্মকার্য্যের ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন না, কিন্তু প্রনষ্ট আত্মসংযম পুনর্লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এই পুস্তক পাঠ ও মনন করিলে তাহারা কিছু সহায়তা পাইবেন। নীচের উপদেশগুলি তাহাদের উপকারে লাগিতে পারে।

১। তুমি যদি বিবাহিত হও, তবে স্ত্রীকে ভোগের সামগ্রী মনে না করিয়া তাহাকে সঙ্গিনী, বন্ধু এবং সহকর্ম্মী মনে করিবে।

২। আত্ম-সংযম জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখন নিজেদের কাজের ফল সম্যকরূপে জানিয়া উভয়ে যৌনমিলনের ইচ্ছা করিবে, মাত্র সেই অবস্থায় ইহা সমর্থন করা যায়।

৩। যদি তুমি অবিবাহিত হও, তবে সমাজ, তোমার ভাবী স্ত্রী ও তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য তুমি আপনাকে পবিত্র রাখিবে। এই কর্ত্তব্যবোধ বাড়াইলে ইহা সমস্ত প্রলোভন হইতে তোমাকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিবে।

৪। যে অদৃশ্য শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অন্তরে অনুভব করি, তিনি সব সময় আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতে-ছেন এবং আমাদের প্রত্যেক অপবিত্র চিন্তার হিসাব রাখিতেছেন— এই কথা মনে থাকিলে সেই শক্তি তোমাকে সব সময় সাহায্য করিবেন।

৫। সংযমীর জীবন-যাপন প্রণালী ভোগীর জীবন-যাপন প্রণালী হইতে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। এই জন্য খাদ্য, বেড়াইবার স্থান, পাঠ্যবিষয় ও সঙ্গী নির্ব্বাচনে খুব সাবধান হইবে।

সাধু ও পবিত্রচরিত্র লোকের সংসর্গে থাকিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্রিয় উত্তেজক উপন্যাস ও মাসিক পত্রাদি বর্জ্জন করিবে এবং যাহা মানবসমাজকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করে সেইরূপ পুস্তকাদি পড়িবে। এমন একখানা বই সব সময় কাছে রাখিবে যাহা বন্ধুর ন্যায় তোমাকে বিপদে আপদে সাহায্য ও সৎপথে চালিত করে।

থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিবে না। যাহাতে উৎসাহ ও কাজ করার শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাই বিশ্রাম, যাহাতে অবসাদ আনে তাহা বিশ্রাম নহে। সার্ব্বজনিক উপাসনায় যোগ দিবে। সেখানকার কথা ও সুর আত্মাকে উন্নত করে।

রসনা তৃপ্তির জন্য খাইবে না, ক্ষুধার শান্তির জন্য খাইবে। অসংযত

লোকে খাওয়ার জন্য বাঁচিয়া থাকে, সংযমী লোকে বাঁচিয়া থাকার জন্য খায়। সব রকম উত্তেজক মশলা মদ প্রভৃতি এবং ভাল মন্দ বিচারশক্তি যাহাতে লোপ করে সেইরূপ তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। আহারের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখিবে।

৬। যখন ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাহায্যের জন্য ভগবানকে ডাকিবে। রামনাম আমার বিশেষ সহায়তা করে। এক টব জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিবে, পা বাহিরে রাখিবে। দেখিবে তৎক্ষণাৎ উত্তেজনা কমিবে। শরীর দুর্ব্বল না হইলে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে; তবে ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে।

৭। শুইবার পূর্ব্বে এবং অতি ভোরে খোলা হাওয়ায় দ্রুত পায়চারী করিবে।

৮। সকালে শুইলে ও সকালে বিছানা ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্য ধন ও জ্ঞান লাভ করা যায়, এই প্রবাদটি সত্য। নয়টায় শুইয়া চারটায় বিছানা ত্যাগ করা উত্তম। খালি পেটে ঘুমাইবে; এ জন্য সন্ধ্যা ছয়টার পর কখনও খাইবে না।

৯। মনে রাখিও ভগবানের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত জীবের সেবা করা এবং এইরূপে ভগবানের মহিমা ও প্রেমের কথা প্রচার করা মানুষের ধর্ম্ম। সেবাকেই আনন্দের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিও; ইহা করিতে পারিলে তোমার অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদ দরকার হইবে না।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ব্রহ্মচর্য্য

সংযমের প্রয়োজনীয়তা

স্বাস্থ্যরক্ষার নানা উপায় আছে। ইহার প্রত্যেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দরকারী ব্রহ্মচর্য্য। বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল এবং পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করে। কিন্তু যে শক্তি আমরা সঞ্চয় করি তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিলে আমরা কিরূপে সুস্থ থাকিব ? যে অর্থ আমরা উপার্জ্জন করি তাহা খরচ করিয়া ফেলিলে আমরা কিরূপে দরিদ্র না হইয়া পারি ? খাঁটি ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, নর-নারী কখনও বলবান হইতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য কি ? ইহার অর্থ এই, নর-নারী পরস্পর সম্বন্ধে কাম-চিন্তা হইতে বিরত থাকিবে। তাহারা কামচিন্তার সহিত পরস্পরকে স্পর্শ করিবে না, স্বপ্নেও এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিবে না। তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রকার কাম-গন্ধ-হীন হইবে। যে গুপ্ত-শক্তি ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শারীরিক নহে, মানসিক ও আত্মিক উদ্যম ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

কিন্তু চারিপাশে আমরা কি দৃশ্য দেখিয়া থাকি? নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ ইন্দ্রিয়-সেবায় নিরত। কামান্ধ হইয়া, তাহারা ন্যায়-অন্যায় বিচার শক্তি হারায়। দেখিয়াছি ইহার মারাত্মক প্রভাবে পড়িয়া বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। ঠিক এইরূপ প্রভাবে পড়িয়া আমিও এরূপ করিয়াছি, ইহার অন্যথা হইবার উপায়ও ছিল না। যে জীবনী-শক্তি আমরা কঠিন পরিশ্রম সহকারে সঞ্চয় করি, ক্ষণিক সুখের জন্য তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি। মোহ দূর হইলে, আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা ভয়ানক দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব করি, এবং মন কোনো কাজ করিতে চায় না। ক্ষতিপূরণ করিবার আশায় আমরা প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ মোদক প্রভৃতি সেবন করি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সব রকম টনিক খাই এবং শরীরের ক্ষয়পূরণ করিবার ও ইন্দ্রিয়-শক্তিলাভের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। এরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়। ক্রমে আমরা বৃদ্ধ হই—তখন আমাদের শরীর ও মনের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত। আমরা যত বৃদ্ধ হইব, আমাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ হইবে—যত দীর্ঘ দিন আমরা বাঁচিব, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল অন্য লোকের উপকারে লাগানর শক্তি তত বাড়িবে। যাঁহারা খাঁটি ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পক্ষে একথা নিশ্চয়ই খাটে। মৃত্যুভয় তাঁহাদের নাই, এবং মৃত্যুকালেও তাঁহারা ভগবানকে ভুলেন না। তাঁহারা মিথ্যা আশা লইয়া মত্ত থাকেন না। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হন এবং শেষদিনের জন্য বীরের ন্যায় অপেক্ষা করেন। ইহারা খাঁটি মানুষ। শুধু ইহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে, ইহারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন।

সংযমের প্রয়োজনীয়তা

আমরা কদাচিৎ ভাবিয়া দেখি যে, অসংযমই জগতের অধিকাংশ দম্ভ, রাগ, ভয় এবং হিংসার মূল। আমাদের মন যদি আমাদের বশে না থাকে, যদি প্রত্যেক দিন এক অথবা একাধিকবার আমরা ছোট শিশুর অপেক্ষা মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করি, তবে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কোন্ পাপ আমরা না করিতে পারি? আমাদের কাজ যতই খারাপ ও পাপপূর্ণ হউক না কেন, তাহার ফল সম্বন্ধে কিরূপে আমরা চিন্তা না করিয়া পারি?

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, "এরূপ খাঁটি ব্রহ্মচারী কে কবে কোথায় দেখেছে? যদি সব লোক ব্রহ্মচারী হয়, তবে কি মানব জাতি লোপ পেয়ে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে না?" ধর্ম্মের দিকটা বাদ দিয়া শুধু পার্থিব দিক দিয়া এই প্রশ্ন আলোচনা করিব। আমার মনে হয়, এরূপ প্রশ্ন শুধু আমাদের ভীরুতার পরিচয় দেয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে যে ইচ্ছাশক্তির দরকার, তাহা আমাদের নাই, সেজন্য আমরা ওজর আপত্তি দেখাই। খাঁটি ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু যদি তাহাদিগকে যখন-তখন দেখা যাইত, তবে ব্রহ্মচর্য্যের কি মূল্য থাকিত? হাজার হাজার শ্রমিক পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীর গর্ত্ত করিয়া স্তূপ স্তূপ পাহাড় কাটিয়া একটু হীরক খুঁজিয়া বাহির করে। ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ মূল্যবান ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্য কত বেশী পরিশ্রম করা উচিত! ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গেলে জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, এরূপ চিন্তা আমাদের না করাই ঠিক। আমরা কি ভগবান যে, আমরা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত চিন্তিত হইব? যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন। অন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে কি না, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যখন আমরা কোনো কারবার অথবা কাজ করিতে শুরু করি,

তখন কি আমরা ভাবিয়া থাকি, যদি সকলেই ইহা করে, তবে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে? খাঁটি ব্রহ্মচারী শেষ পর্য্যন্ত এরূপ প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবেন।

কিন্তু যাহারা পার্থিব চিন্তায় বিব্রত, তাহারা এই আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? বিবাহিতেরা কি করিবে? যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে তাহারা কি করিবে? যাহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারে না, তাহারা কি করিবে? পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এক শ্রেষ্ঠ আদর্শে আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। এই আদর্শ সর্ব্বদা চোখের সামনে রাখিয়া সেখানে পৌঁছানর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দিবার সময় আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অক্ষরই দেখাই, এবং তাহারা যথাসাধ্য ঐ অক্ষর লিখিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া গেলে আমরা পরিশেষে সফলকাম হইতে পারি। বিবাহিত জীবন হইলেই বা ক্ষতি কি? প্রকৃতির নিয়ম এই, যখন স্বামী-স্ত্রী সন্তান লাভের ইচ্ছা করিবে, তখন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করা চলে। ইহা মনে রাখিয়া যাহারা চার পাঁচ বৎসরের ভিতর একদিন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা কামের দাস নহেন; তাঁহারা সঞ্চিত জীবনী-শক্তির বেশী কিছু হারাইবেন না। কিন্তু হায়! শুধু সন্তানলাভের জন্য সহবাস করেন এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কত কম! অধিকাংশ লোক কামপ্রপীড়িত হইয়াই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে—ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাদের সন্তান জন্মে। ইন্দ্রিয়সুখে পাগল হইয়া আমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা কিছু ভাবি না। এ বিষয়ে নারী অপেক্ষা পুরুষজাতি অধিক দোষী। পুরুষ এত কামান্ধ যে, স্ত্রীর শরীর দুর্ব্বল কি না, সে গর্ভধারণ করিতে এবং সন্তান পালন করিতে সক্ষম

কি না, সে-চিন্তা সে কখনও করে না। পাশ্চাত্যদেশে লোকে সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করে, কিন্তু পিতামাতার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। এই বিষয়ে অনেক বই লেখা হইয়াছে এবং সন্তান নিরোধ করার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবসায় চলিতেছে। আমরা এখনও এই পাপ হইতে মুক্ত; কিন্তু নারীর উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি না এবং একবার এ-চিন্তাও করি না যে, আমাদের শিশুগণ শক্তি সামর্থ্যহীন। সন্তান জন্মিলে প্রত্যেকবার আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দি এবং এই-রূপে আমাদের পাপ ঢাকিতে চেষ্টা করি। দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিকলাঙ্গ এবং ভীরু সন্তান লাভ করিয়া নিজদিগকে ভগবানের ক্রোধের পাত্র মনে করা কি উচিত নয়? বালক বালিকার সন্তান হওয়া কি আনন্দের বিষয়? ইহা কি বরং একপ্রকার অভিশাপ নহে? কোনো চারাগাছে ফল হইলে গাছ দুর্ব্বল হয়, এজন্য যাহাতে ফল বিলম্বে হয় তাহার জন্য সকল চেষ্টাই আমরা করি। কিন্তু বালক-বালিকা সন্তানের পিতা-মাতা হইলে, আমরা ভগবানের প্রশংসাগীতি গাহি। ইহা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক কি কিছু হইতে পারে? আমরা কি মনে করি, ভারতে এবং অন্যত্র এরূপ অসংখ্য শিশু বাড়িতে থাকিলে জগতে মুক্তি আসিবে? এ-বিষয়ে আমরা ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক হীন; কারণ তাহারা শুধু সন্তান উৎপত্তির জন্য সংবাস করে। গর্ভধারণের সময় হইতে শিশুর দুগ্ধত্যাগের সময় পর্য্যন্ত নর-নারীর পৃথক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণঘাতী আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া আমরা এই মহান্ কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাই। এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের মনকে দুর্ব্বল করে এবং অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দুঃখময় জীবনের অবসান হয়। বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, বিবাহিত

লোকে তাহা যেন বুঝেন এবং সন্তানলাভের ইচ্ছা না হইলে যেন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করেন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এ পথে চলা বড় শক্ত। আমাদের খাদ্য, জীবনযাপন প্রণালী, কথাবার্ত্তা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন যে, ইহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বিষের ন্যায় আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে। এই দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ সন্দেহ করেন, তাঁহাদের জন্য এই বই লেখা হয় নাই; যাঁহারা ইহা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত এবং আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট, এ বই তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহারা ইহা পড়াও কষ্টকর মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

যে-কিছু বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যাঁহারা এখনও অবিবাহিত আছেন, তাঁহারা যেন অবিবাহিত থাকিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যদি তাঁহারা বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তবে যতদূর সম্ভব দেরী করিয়া যেন বিবাহ করেন। যুবকেরা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে শারীরিক উপকার ভিন্ন অন্যান্য যে-সব উপকার পাওয়া যায়, সে কথা এখানে আলোচনা করিব না।

যে-সব অভিভাবক এই অধ্যায় পড়িবেন, তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাঁহারা যেন তাঁহাদের শিশু

পুত্রদের গলায় পাষাণ বাঁধিয়া না দেন। নিজেদের বৃথা অভিমান চরিতার্থের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা যেন বংশগৌরব অথবা সম্মান সম্বন্ধে সব-রকম ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হন এবং এরূপ হৃদয়হীন প্রথার স্রোতে গা ভাসাইয়া না দেন। যদি তাঁহারা সন্তানসন্ততির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে তাঁহারা যেন তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যখন তাহারা শিশু-মাত্র, তখন তাহাদের বিবাহ দিয়া এবং জীবনের গুরু দায়িত্ব ও ভাবনা-চিন্তা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তান-সন্ততির ভীষণ অনিষ্ট করেন।

প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে বিপত্নীক এবং বিধবার পুনর্বিবাহ করা ঠিক নহে। যুবক যুবতীর জীবনীশক্তি মাঝে মাঝে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত কি না, এ সম্বন্ধে ডাক্তারদের ভিতর মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন ইহা উচিত, কেহ কেহ বলেন অনুচিত। ডাক্তারদের ভিতর যখন এই মতভেদ, তখন ডাক্তাররা সমর্থন করেন ভাবিয়া, আমরা যেন বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়সেবা না করি। নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহবাস কেবলমাত্র অনাবশ্যক নহে, বরং ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সঞ্চয় করি, বীর্য্যের একবারমাত্র অপব্যবহারে তাহা মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়। এই প্রনষ্ট জীবনীশক্তি উদ্ধার করিতে অনেক সময় আবশ্যক হয় এবং একথা বলাও চলে না যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। ভাঙ্গা আয়না মেরামত করিয়া কাজ চালান যায়, কিন্তু ইহা ভাঙ্গা আয়না ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মচর্য্য

পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল, স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পবিত্র চিন্তা ভিন্ন জীবনীশক্তি রক্ষা করা অসম্ভব। স্বাস্থ্য ও নীতি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ট যে, পবিত্র জীবন যাপন না করিলে, আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি না। অতীতের ভুল-ত্রুটীর কথা ভুলিয়া, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত পবিত্র জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে অচিরে ইহার ফল পাইবে। যাঁহারা অল্প সময়ের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহারাও দেখিবেন, তাঁহাদের শরীর ও মনের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কোনোমতে তাঁহারা এই সম্পত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন না। ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য পূর্ণভাবে বুঝিয়াও আমি ইহা ভঙ্গ করিয়াছি এবং এজন্য যথেষ্ট ভুগিয়াছি। এই পতনের আগের এবং পরের অবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আমি লজ্জা ও অনুতাপে মরিয়া যাই। কিন্তু অতীতের ভুল হইতে আমি এই সম্পত্তি অটুটভাবে রক্ষা করিতে শিখিয়াছি; এবং পূর্ণ বিশ্বাস করি, ভগবানের করুণায় ভবিষ্যতে আমি ইহা রক্ষা করিতে পারিব, কারণ আমি নিজে ব্রহ্মচর্য্যের অমূল্য ফলের স্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকালে আমার বিবাহ হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই আমি সন্তানের পিতা হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া দেখিলাম, মানবজীবনের মূল নিয়ম সম্বন্ধে আমি কত অজ্ঞ। যদি অন্তত পক্ষে একজন পাঠকও আমার পতন এবং অভিজ্ঞতার কথা জানিয়া হুঁসিয়ার ও লাভবান হন, তবে এই অধ্যায় লেখা সার্থক হইয়াছে মনে করিব। অনেকে আমাকে বলিয়াছেন, এবং আমিও ইহা বিশ্বাস করি যে, আমার যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি আছে, এবং আমার মন কোনোরূপে দুর্ব্বল নহে। কেহ কেহ বলেন, আমার শক্তি এত বেশী যে আমাকে একগুঁয়ে বলাও চলে;

তথাপি অতীতের কার্য্যের ফলস্বরূপ আমার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা আছে। অবশ্য বন্ধুদের তুলনায় আমি নিজেকে সুস্থ ও বলবান বলিতে পারি। বিশ বৎসর ইন্দ্রিয়সেবার পরও, আমি যখন এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছি, তখন ঐ বিশ বৎসরও যদি পবিত্র থাকিতে পারিতাম, তবে আমার অবস্থা আরও কত ভাল হইত! আমার এ বিশ্বাস পুরোপুরি আছে, যদি সারাজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতাম, তবে আমার উৎসাহ ও শক্তি হাজার গুণ বেশী হইত এবং আমি সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের ও দেশের কাজ করিতাম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া, আমার ন্যায় অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী যদি এত উপকার পাইয়া থাকে, তবে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি লাভ হইবে, তাহা কত বিস্ময়জনক!

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম যখন এত কঠিন, তখন যাহারা অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়সেবা করে, তাহাদিগকে কি বলিব? ব্যভিচার এবং বেশ্যাবৃত্তি হইতে উদ্ভূত পাপ, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের একটি কঠিন সমস্যা। স্বাস্থ্য-নীতি-গ্রন্থে ইহা পূর্ণভাবে আলোচিত হইতে পারে না। এখানে এইটুকু দেখাইব, যাহারা এ-সব পাপে লিপ্ত, তাহাদের ভিতর সহস্র সহস্র লোক কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই হিসাবে ভগবান দয়ালু যে, তিনি পাপীকে শীঘ্রই শাস্তি দেন। এইসব লোকের জীবন হাতুড়ে চিকিৎসকের শোচনীয় দাসত্বের ভিতর থাকিয়া শীঘ্রই শেষ হয়—তাহারা বৃথা তাহাদের ব্যাধির ঔষধ খুঁজিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হইলে বর্ত্তমানে যত ডাক্তার আছে, অন্ততঃ পক্ষে তার অর্দ্ধেকের কাজ থাকিবে না। এইসব কুৎসিত ব্যাধি মানুষকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, চিন্তাশীল চিকিৎসকগণ স্বীকার

করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যতদিন ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি থাকিবে, ব্যাধিনিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার সত্ত্বে, ততদিন মানব জাতির কোনো আশা নাই। এইসব ব্যাধির ঔষধ এত বিষাক্ত যে, সাময়িক উপকার করিলেও তাহারা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, এবং এইসব রোগ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কিরূপে বিবাহিত লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শুধু বাতাস, জল ও খাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। স্ত্রীর সহিত স্বামী গোপনে সাক্ষাৎ করিবে না। সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, স্বামী স্ত্রীর গোপনে থাকার উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয়সেবা। রাত্রে তাহারা পৃথক পৃথক কুঠরীতে থাকিবে এবং দিনের বেলায় সর্ব্বদা ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিবে। তাহারা এমন সব বই পড়িবে, যাহাতে তাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ হয়। তাহারা বড় বড় লোকের জীবনী আলোচনা করিবে এবং একথা সব সময় মনে রাখিবে যে, ইন্দ্রিয়সেবা বহুদুঃখের মূল কারণ। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা হইলেই শীতল জলে স্নান করিবে, ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমিয়া যাইবে এবং সৎকাজ করিবার শক্তি বাড়িবে। একাজ করা শক্ত; কিন্তু অসুবিধার সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে। এরূপ করিবার সঙ্কল্প যাহার নাই, সে কখনও প্রকৃত স্বাস্থ্য সুখ লাভ করিতে পারে না।*

---

*গান্ধীজীর লেখা গুজরাতী আরোগ্য-বিষে সামান্য জ্ঞান (স্বাস্থ্যনীতি) হইতে।

গোপন কথা

কৌমার্য্য-ব্রতকে ব্রহ্মচর্য্য বলা চলে—অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য কৌমার্য্য অপেক্ষা ব্যাপক। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর আয়ত্তে রাখাই ব্রহ্মচর্য্য। পূর্ণ-ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা হইল আদর্শ অবস্থা—লোকে কদাচিৎ এ অবস্থায় পৌছিয়া থাকে। ইউক্লিডের রেখা কল্পনা করা চলে, কিন্তু আঁকা যায় না; তথাপি ইহা জ্যামিতির এক প্রধান সংজ্ঞা এবং ইহার সাহায্যে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ হয়। পূর্ণ ব্রহ্মচারীর আদর্শ এইরূপ কল্পনার বস্তু। কিন্তু আমরা যদি ইহাকে সব সময় মনশ্চক্ষুর সাম্‌নে না রাখি, তবে আমাদের দশা হালশূন্য জাহাজের ন্যায় হইবে। কল্পিত আদর্শের যত বেশী কাছে আমরা পৌছিব, ততই আমাদের পূর্ণতা আসিবে।

এখন কৌমার্য্য-অর্থে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে হইলে, চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পূর্ণ সংযম চাই। যে জাতির ভিতর এরূপ লোক নাই, তাহার অবস্থা শোচনীয়। জাতির অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমাদের ভিতর বেশীমাত্রায় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি আছে। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিতেছে। দাসত্বের চক্রে পিষ্ট হইয়া

আমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে যে, আমাদের অনেকে ইহাকে দাসত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না; এবং দেশের উপর আর্থিক মানসিক ও নৈতিক শোষণরূপ তিন রকম অভিসম্পাৎ থাকা সত্ত্বে, তাঁহারা বলেন, দেশ ক্রমশঃ উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

* * * *

এরূপ মনুষ্যত্ব-নষ্টকারী আবহাওয়ার মধ্যে কি জানিয়া শুনিয়া আমাদের সন্তান উৎপাদন করা ঠিক? যতদিন আমরা নিজদিগকে অসহায় মনে করিব এবং অসহায় থাকিব, যতদিন ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইব, ততদিন সন্তান উৎপাদন করিলে শুধু গোলাম ও দুর্ব্বল লোকের সংখ্যা বাড়ান হইবে। যতদিন ভারত স্বাধীন না হইবে, যতদিন ভারতবাসী নিবার্য্য অনাহারজনিত মৃত্যুকে ঠেকাইতে না পারিবে এবং দুর্ভিক্ষকালে ও অন্যসময়ে অন্নাভাব হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসী ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী নিবারণের জ্ঞানলাভ না করিবে, ততদিন আমাদের সন্তানজন্ম দেওয়ার অধিকার নাই। এই অভিশপ্ত দেশে সন্তানজন্মের খবর পাইলে আমি ব্যথিত হই। বৎসরের পর বৎসর স্বেচ্ছায় সন্তান জন্ম না দেওয়ার কথা ভাবিয়া, আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি।

* * * *

কিরূপে এই সন্তান-উৎপাদন বন্ধ রাখিতে হইবে? ইউরোপে যেরূপ নীতি-বিগর্হিত কৃত্রিম উপায়ে ইহা করা হয়, তাহা করিলে চলিবে না, কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযমের সাহায্যে ইহা করিতে হব। মাই-বাপ সন্তানকে যেন ব্রহ্মচর্য্য পালন করা শিক্ষা দেন।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ২৫ বৎসরের কম বয়সে বালকের বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। ভারতের মা-দিগকে যদি বুঝান যাইত যে, বালক-বালিকাদিগকে বিবাহিত জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া পাপ, তবে ভারতের অর্দ্ধেক বিবাহ আপনা হইতে বন্ধ হইত। এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়া, বালিকাদের গর্ভধারণ শক্তি অল্পবয়সে উৎপন্ন হয়, এই ভূয়া কথায় যেন আমরা বিশ্বাস না করি। ইহার চেয়ে সাংঘাতিক কুসংস্কারের কথা আমি জানি না। আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতেছি, গর্ভধারণের বয়সের সহিত আবহাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমাদের পারিবারিক জীবনের মানসিক ও নৈতিক বেষ্টনীই অসময়ে গর্ভধারণের মূল কারণ। নির্দ্দিষ্ট বয়সে যে তাহাদের বিবাহ হইবে, একথা মা এবং অপর আত্মীয়েরা ধর্ম্মকাজের ন্যায় শিশুদিগকে শিক্ষা দেন। শিশুকালে এমন কি কোলে থাকিতেও, তাহাদের বিবাহের কথা ঠিক হয়। শিশুদের পোষাক ও খাদ্য ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। শিশুদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমাদের নিজেদের খেয়াল তৃপ্তির জন্য আমরা তাহাদিগকে পুতুলের মত সাজাই। আমি অনেক শিশুকে লালন পালন করিয়াছি। যে রকম পোষাক তাহাদিগকে দিয়াছি, তাহাই তাহারা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সব রকম গরম উত্তেজক খাদ্য খাইতে দিই। মোহ বশে তাহাদের শক্তির কথা ভাবি না। ফলে অসময়ে যৌবন প্রাপ্তি, অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান-সন্ততির জন্ম এবং অকাল-মৃত্যু হয়। পিতামাতার দৃষ্টান্ত বালকেরা সহজে গ্রহণ করে। নিজেরা বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া, তাঁহারা শিশুদের নিকট অসংযত জীবনের আদর্শ হইয়া উঠেন। অসময়ে যখনই কোনো নূতন জীব পরিবারে দেখা দেয়, তখনই

আমোদ-প্রমোদ ও নিমন্ত্রণের ঘটা পড়িয়া যায়। যেরূপ আবহাওয়ার ভিতর আমরা থাকি, তাহাতে যে আমরা আরও অসংযত হই নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার ইহাতে একটুও সন্দেহ নাই যে, বিবাহিত লোকে যদি দেশের মঙ্গল চান এবং ভারতভূমিকে সুন্দর শক্তিশালী পূর্ণাবয়ব পুরুষ ও স্ত্রী দ্বারা অধ্যুষিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা যেন সাময়িকভাবে পূর্ণ সংযম অভ্যাস করেন ও সন্তান উৎপত্তি বন্ধ রাখেন। নূতন বিবাহিতদিগকেও আমি এই পরামর্শ দেই। মাতাল অথবা পরিমিত মদ্যপানকারী অপেক্ষা যিনি কোনো দিন মদ খান নাই, তাঁর পক্ষে মদ না খাইয়া থাকা যেমন বেশী সহজ, তেমনি কোনো কাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা, তাহা মোটেই আরম্ভ না করা উচিত। মাটিতে পড়িয়া উঠার অপেক্ষা প্রথম হইতে খাড়া থাকা সহজ। যাঁহারা বলেন, যাহাদের ভোগবাসনা তৃপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের নিকটে সংযমের কথা বলা উচিত, তাঁহারা ভুল করেন। দুর্ব্বল দেহধারীর নিকট সংযমের কথা বলায় কোনো লাভ নাই। আমার কথা এই, আমরা যুবকই হই অথবা বৃদ্ধ হই, তৃপ্ত অথবা অতৃপ্ত হই, বর্ত্তমান সময়ে গোলামের সংখ্যাবৃদ্ধি না করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

স্বামী-স্ত্রীকে বলিব, তাঁহারা যেন পরস্পরের অধিকারের কথা না ভাবেন। অসংযমের পথে চলার জন্য সম্মতির দরকার; সংযমের পথে চলার জন্য ইহার দরকার নাই, ইহা স্পষ্ট সত্য।

জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া আমরা যখন শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করিতেছি, তখন ইহার জন্য আমাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। যে জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে,

আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব না। এই ব্যক্তিগত পবিত্রতা না আসিলে আমরা গোলামের জাতি থাকিয়া যাইব। শাসন প্রথাকে দূষিত মনে করি বলিয়া, ইংরেজদিগকে যেন আমরা হীন মনে না করি। ইহাতে আত্মবঞ্চনা করা হইবে। কোনো আড়ম্বর না করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবনকে ধর্ম্মপথে চালায়। আমাদের দেশে যত কৌমার্য্যব্রতধারী স্ত্রী পুরুষ আছে, তাহাদের দেশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আছে। আমাদের দেশে কুমারী নাই বলিলেই চলে। অবশ্য যাহারা রাজনীতির কোনো ধার ধারেন না, এরূপ কতকগুলি মঠবাসিনী নারী আছেন। কিন্তু ইউরোপে হাজার হাজার কৌমার্য্যব্রতধারী নারী আছেন।

আমি পাঠকদের সামনে এখন কয়েকটি সরল নিয়ম পেশ করিব। এগুলি শুধু আমার ও আমার সঙ্গীদের অনেকের অভিজ্ঞতালব্ধ।

(১) বালক বালিকাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করিতে পারে, তাহারা নিষ্পাপ এবং নিষ্পাপ থাকিতে পারে।

(২) সকল গরম উত্তেজক দ্রব্য, লঙ্কার ন্যায় মশলা, চর্ব্বিযুক্ত জমাট খাদ্য, মিষ্টদ্রব্য এবং ভাজা জিনিষ বর্জ্জন করিবে।

(৩) স্বামী-স্ত্রী পৃথক ঘরে থাকিবে এবং কখনও নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবে না।

(৪) শরীর ও মনকে সব সময় সৎকাজে নিয়োজিত রাখিবে।

(৫) সকালে শোয়া এবং সকালে বিছানা হইতে ওঠা কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে।

(৬) সব রকম কদর্য্য সাহিত্য বর্জ্জন করিতে হইবে। সৎচিন্তাই কুচিন্তা দূর করিবার উপায়।

(৭) ইন্দ্রিয়উত্তেজক থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

(৮) স্বপ্নদোষ হইলে কোনো ভাবনা করিতে হইবে না। এই অবস্থায় সাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রাতঃস্নানই বিশেষ উপকারী।

(৯) মধ্যে মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিয়া চলিলেই অনিচ্ছায় স্বপ্নক্ষরণ বন্ধ হইবে, এই ধারণা ভুল।

(১০) এই সংযম এত কঠিন নহে যে, স্বামীস্ত্রীর পক্ষেও ইহা পালন করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে সংযমকে সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে করা উচিত।

(১১) প্রত্যহ মনোপ্রাণে প্রার্থনা করিলে লোকে ক্রমশঃ পবিত্র হইতে পারে।

ইয়ং-ইণ্ডিয়া—১৩ই অক্টোবর, ১৯২০

ব্রহ্মচর্য্য

এই বিষয়ে কিছু লেখা সহজ নহে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদিগকে জানাইব ভাবিয়াছি। আমার নিকট কতকগুলি চিঠি আসিয়া এই ইচ্ছা বাড়াইয়াছে।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহা ষোল আনা পালন করা সম্ভব কি না? সম্ভব হইলে, আপনি ইহা পালন করেন কি না?"

ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থ ব্রহ্ম-অন্বেষণ। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন। ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মকে খুঁজিতে হইবে। পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত এ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অতএব সব সময় সব অবস্থায় কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

যে পুরুষ ও স্ত্রী এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি সম্পূর্ণ-রূপে নির্ব্বিকার। এইরূপ নির্ব্বিকার ব্যক্তি ভগবানের নিকটে বাস করেন; তিনি ভগবান-সদৃশ।

ইহাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই যে, কায়মনোবাক্যে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ষোল আনা পালন করা যাইতে পারে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমি এখনও পূর্ণ ব্রহ্মচারী হইতে পারি নাই। সেই অবস্থায় পৌঁছিতে অবিরত চেষ্টা করিতেছি; এবং এই শরীরেই সেখানে পৌঁছিবার আশা ত্যাগ করি নাই। আমি শরীরকে বশে আনিয়াছি। জাগ্রত অবস্থায় আমি সংযম রক্ষা করিতে পারি। বাকসংযম আমার একরূপ অভ্যাস হইয়াছে। চিন্তায়

সংযম আমার এখনও আসে নাই। এক চিন্তা করার সময় অন্য চিন্তাও আসিয়া পড়ে। এজন্য চিন্তারাজ্যে অনবরত লড়াই চলে।

অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি; এ সময় মনে কোনো কুচিন্তা আসে না। কিন্তু ঘুমের সময় চিন্তাকে এত সংযত রাখিতে পারি না। নিদ্রাকালে অনেক রকম চিন্তা আসে। যাহা কোনো দিন ভাবি নাই, সেরূপ স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখি। এই শরীর দ্বারা যাহা ভোগ করিয়াছি, সেই সব বাসনার কথাও মনে পড়ে। এইসব বাসনা অপবিত্র হইলে কু-স্বপ্ন দেখি। যার ইন্দ্রিয়বিকার হয় তার এ অবস্থা হইতে পারে।

আমার এইরূপ চিন্তা-বিকার কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। যদি আমি চিন্তায় সংযমী হইতাম, তবে গত দশ বৎসরের মধ্যে জ্বর, আমাশয় ও এপেণ্ডিসাইটিস ব্যারামে ভুগিতাম না। আমি মানি, নিষ্পাপ আত্মা নীরোগ শরীরে বাস করে—অর্থাৎ আত্মা যত নিষ্পাপ ও নির্ব্বিকার হয়, শরীরও তত নীরোগ হয়। নীরোগ শরীরের অর্থ বলবান শরীর নয়। শক্তিশালী আত্মা ক্ষীণ শরীরেই বাস করে। আত্মার শক্তি যেমন বাড়িতে থাকে, নির্দ্দিষ্ট সীমার পর শরীরের ক্ষীণতাও তেমনি বাড়ে। সম্পূর্ণ নীরোগ দেহ বহুত ক্ষীণ হইতে পারে। বলবান শরীরে অনেক রোগ থাকিতে পারে। রোগ না হইলেও ছোঁয়াচে অথবা সংক্রামক ব্যাধি এইরূপ শরীরকে সহজে আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ নীরোগ শরীরে এ সব আক্রমণ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ রক্ত এই সব সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করে।

এরূপ অবস্থায় পৌছান অবশ্য শক্ত, নহিলে আমি এতদিন সেখানে পৌছিতাম ; কারণ আমার অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দিবে যে, যে-উপায়ে এই অবস্থায় পৌছান যায়, আমি তাহা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করি নাই। এমন কোনো বাহিরের বাধা নাই, যাহা আমাকে ঐ আদর্শ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ ; কিন্তু পুরাতন সংস্কার মন হইতে মুছিয়া ফেলা সকলের পক্ষে সহজ নহে। এজন্য দেরী হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আমি মোটেই নিরাশ হই নাই, কারণ পূর্ণ নির্ব্বিকার অবস্থার চিত্র আমি কল্পনার চোখে দেখিতেছি। আমি তাহার অস্পষ্ট আলোকরশ্মি দেখিয়াছি এবং এ পর্য্যন্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে নিরাশ না হইয়া আশান্বিত হইয়াছি। আশাপূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি আমার এ দেহ নষ্ট হয়, তবে আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে মনে করিব না। এই শরীরকে যতখানি বিশ্বাস করি, পুনর্জন্মে আমি ততখানি বিশ্বাস করি। আমি জানি স্বল্প প্রযত্নও ব্যর্থ হয় না।

যাঁহারা আমার নিকট চিঠি দিয়াছেন এবং যাঁহারা এই প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ধৈর্য্য ও আত্ম-বিশ্বাস বাড়িবে বিশ্বাসে, আমি নিজের কথা এত করিয়া বলিলাম। সকলের আত্মা এক। সকলের আত্মার শক্তি একরূপ হইতে পারে। কাহারও শক্তির বিকাশ হইয়াছে এবং কাহারও হয় নাই। চেষ্টা করিলে প্রত্যেকে এই শক্তির বিকাশ করিতে পারেন।

এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক অর্থ আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যের লৌকিক বা প্রচলিত অর্থ কায়মনোবাক্যে কামদমন। এই সীমাবদ্ধ অর্থ বেশ। কারণ এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করাও অনেক শক্ত। সমস্ত ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ রসনেন্দ্রিয়-সংযমের কথা লোকে বিশেষরূপে ভাবে নাই। রসনা বা আহার সংযমের দিকে লোকের লক্ষ্য যায় নাই

বলিয়া, কামদমন এত মুস্কিল ও প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। তার উপর চিকিৎসকগণ বলেন, রুগ্ন শরীরে বিষয়বাসনা অধিক থাকে এবং দুর্ব্বল জাতির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বভাবত কঠিন।

আমি উপরে ক্ষীণ অথচ নীরোগ শরীর সম্বন্ধে লিখিয়াছি। কেউ না ভাবেন আমি শারীরিক বলচর্চ্চা করিতে নিষেধ করিয়াছি। আমি সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্যের কথা অতি সরল ভাষায় লিখিয়াছি। ইহা লোকে ভুল বুঝিতে পারে। যিনি পূর্ণ সংযম চান, শরীর ক্ষীণ হইলে, তাহাকে আনন্দিত হইতে হইবে। যখন শরীরের প্রতি মোহ ও আসক্তি নষ্ট হইবে, তখন শারীরিক বলের অধিকারী হওয়ার ইচ্ছাও থাকিবে না। অবশ্য খাঁটি ব্রহ্মচারীর শরীর অতি তেজ-পূর্ণ ও বলশালী না হইয়া পারে না। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যও অলৌকিক। স্বপ্নাবস্থায়ও যাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার হয় না, তিনি জগদ্বরেণ্য। এইরূপ ব্যক্তি সহজে অপর ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারেন।

এই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—'আমার অবস্থা শোচনীয়। আফিস আদালতে থাকার সময়, রাস্তা-ঘাটে চলার সময় পড়ার সময়, কাজ করার সময়, উপাসনার সময়, দিনরাত্রি সব সময় কামচিন্তা করি। কিরূপে মনকে সংযত করিব? কিরূপে নারীজাতির প্রতি মাতৃভাব পোষণ করিতে শিখিব? কিরূপে দৃষ্টি পবিত্র প্রেমপূর্ণ হইবে? কুচিন্তা কিরূপে নির্ম্মূল হইবে? ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক আপনার পুরাতন লেখা আমার নিকট আছে, কিন্তু তাহা হইতে কোনো সাহায্য পাইতেছি না।'

এ অবস্থা হৃদয়বিদারক। অনেকে এরূপে কষ্ট পান। পরন্তু যতক্ষণ মন কুচিন্তার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে, ততক্ষণ নিরাশ হইবার কারণ নাই। খারাপ দৃশ্য দেখিলে চোখ বুজিতে হইবে, খারাপ কথা

শুনিলে তূলা দিয়া কান বন্ধ করিতে হইবে। মাটির দিকে চাহিয়া পথচলার রীতি ভাল ; ইহাতে চোখ বিপথে চলার অবসর পাইবে না। যেখানে কুকথা অথবা কুসঙ্গীত হয়, সেখান হইতে সরিয়া যাইবে। সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা একসাথে করা চাই।

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, যিনি রসনা সংযত করেন নাই, তিনি কামদমন করিতে পারিবেন না। রসনাসংযত করা খুব কঠিন। কিন্তু রসনা সংযমের সঙ্গে সঙ্গে কাম দমনের সম্ভাবনা আছে। পুরোপুরি অথবা যথাসাধ্য মশলা ত্যাগ করা লোভ দমনের এক উপায়। দ্বিতীয় উপায়, যাহা কিছু আমরা খাই তাহা জিহ্বার তৃপ্তির জন্য খাই না, শরীর রক্ষার জন্য খাই—এই ভাবকে বৃদ্ধি করা। অবশ্য ইহাও শক্ত। শ্বাসগ্রহণের জন্য আমরা হাওয়া খাই, স্বাদের জন্য নহে। পিপাসা নিবারণের জন্য জল পান করি। এইরূপে কেবল ক্ষুধাশান্তির জন্য আমাদের খাওয়া দরকার। শিশুকাল হইতেই মা বাপ আমাদিগকে উল্টা শিক্ষা দেন। আমাদের শরীর-পুষ্টির দিকে নজর না দিয়া, জিহ্বার তৃপ্তিকর নানাপ্রকার জিনিষ খাওয়াইয়া তাঁহারা আমাদিগকে আলালের ঘরের দুলাল করিয়া তোলেন। এরূপ অবস্থার সহিত আমাদিগকে লড়িতে হইবে।

কামদমনের স্বর্ণ-উপায়, 'রামনাম' অথবা এইরূপ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা। দ্বাদশ মন্ত্রেও † হইবে। প্রত্যেকেই নিজের মন অনুসারে মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া জপ করিবেন। আমি বাল্যকাল হইতে রামনাম লইতে শিক্ষা পাইয়াছি ; এই নাম করিয়া আমি সব সময় বল পাইয়াছি। এজন্য আমি রামনামের উল্লেখ করিয়াছি। যিনি যে মন্ত্রই গ্রহণ করুন না কেন, জপিবার সময় তাহাতে তন্ময়

† ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

হওয়া চাই। প্রথম প্রথম জপকালে অন্যকথা মনে আসিলেও চিন্তা নাই। শ্রদ্ধার সহিত নাম জপিতে থাকিলে, পরে সফলতা নিশ্চয়ই আসিবে—ইহাতে আমার একরত্তিও সন্দেহ নাই। এই মন্ত্রকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে ধরিতে পারিলে, ইহাই সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারে। আর্থিক লাভের জন্য কেহ যেন এই মন্ত্র খাটাইতে না যান। নৈতিক চরিত্র রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হইলে, ইহার ফল বিস্ময়কর হইবে। অবশ্য একথা মনে রাখা চাই যে, শুধু তোতার ন্যায় আওড়াইলে মন্ত্রে কোন ফল দিবে না—ইহার ভিতর মনোপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। তোতাপাখী যন্ত্রের ন্যায় ইহা পড়িয়া থাকে। এই মন্ত্র জপিলে কুচিন্তা নিকটে আসিতে পারিবে না, এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া ইহা জপিতে হইবে।

হিন্দী-নবজীবন—২৫শে মে, ১৯২৪

আত্ম-সংযম

ভাদ্‌রণ নামক স্থানে এক মানপত্রের উত্তরে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম এখানে দেওয়া গেল :—ব্রহ্মচর্য্য এমন জিনিষ যাহা বলিয়া বুঝান যায় না। আপনারা তো মামুলি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শুনিতে চান। সমস্ত ইন্দ্রিয়সংযম রূপ ব্যাপক ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে জানিতে চান না। এই সাধারণ ব্রহ্মচর্য্যকেও শাস্ত্রকারগণ খুব কঠিন বলিয়াছেন—এ কথা সত্য। আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয় সংযত রাখি না বলিয়া, ইহা পালন করা কঠিন ঠেকে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল রসনেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি লোভ দমন করিতে পারে, তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন সহজ। প্রাণীবিদগণ বলেন, পশুরা যতটা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, মানুষ ততটা করে না। ইহা সত্য। ইহার কারণ পশুগণ আপনাদের রসনাকে পুরোপুরি নিগ্রহ করে। ইচ্ছা করিয়া তাহারা ইহা করে না, স্বভাবত ইহা করে। পশুরা শুধু ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে, তাও পেট ভরার মত খায়। তাহারা বাঁচিয়া থাকার জন্য খায়, খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। পরন্তু আমরা তো ইহার উল্টা করি। মা সন্তানকে রকমারি সুস্বাদু জিনিষ খাওয়ান। তিনি মনে করেন ইহাই সন্তানের প্রতি স্নেহ দেখানর সর্ব্বোত্তম উপায়। ইহার ফলে ঐ সব জিনিসের স্বাদ বাড়ে না, কমে। স্বাদ তো থাকে ক্ষুধার ভিতর। ক্ষুধার সময় শুকনা রুটিও মিঠা লাগে; ক্ষুধা না থাকিলে মিঠা জিনিষও বিস্বাদ ঠেকে। আমরা নানারকম জিনিষ ঠাসাঠাসি করিয়া খাইয়া পেট বোঝাই করি,

আর বলি, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যাইতেছে না। দেখিবার জন্য যে চোখ ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা তাহা কলুষিত করি এবং যে সব জিনিষ দর্শনযোগ্য তাহা দেখা শিক্ষা করি না। 'মায়ের কেন গায়ত্রী না পড়া ঠিক এবং তিনি কেন সন্তানকে গায়ত্রী শিখাইবেন না?' ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া গায়ত্রীতত্ত্ব সূর্য্যোপাসনা কি তাহা বুঝাইয়া সূর্য্যের উপাসনা করানই ভাল। সনাতনী আর্য্যসমাজী সকলেই তো সূর্য্যের উপাসনা করিতে পারে। আমি তো আপনাদের সামনে স্থূল অর্থ উপস্থিত করিয়াছি। এই উপাসনার অর্থ কি? আপনার শির উঁচু করিয়া সূর্য্যরূপ নারায়ণকে দর্শন করিয়া চক্ষু শুদ্ধ করাই এই গায়ত্রীর উদ্দেশ্য। গায়ত্রী-রচয়িতা ঋষি ছিলেন, দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, সূর্য্যোদয়ে যে নাটক, যে সৌন্দর্য্য, যে লীলার অভিনয় হয় তাহা আর কোথাও হয় না। ভগবানের ন্যায় চিত্রশিল্পী এবং আকাশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রঙ্গভূমি কোথাও নাই। কিন্তু কোন্ মা সন্তানের চোখ ধোয়াইয়া তাহাকে আকাশ দর্শন করাইয়া থাকেন? ইহা ভিন্ন মায়ের ভালবাসার ভিতর তো মোহ আছে। ঘরে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, শিশুরা তাহাই শিক্ষা করিবে। কিন্তু কয়জনে একথা ভাবে, জানা-অজানা যত কথা বালক শোনে, তার মধ্য হইতে সে কতকগুলি কথা শিখিবে। মা-বাপ আমাদের শরীরকে নানা রকম পোষাক দিয়া সাজান। কিন্তু ইহাতে শোভা বাড়ে কই? শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কাপড় ব্যবহার করি, সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য নহে। বালককে যখন আমরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসাইয়া দিব, অথবা খেলাধূলায় যোগ দিতে পাঠাইব, কিম্বা ক্ষেতের কাজে লাগাইয়া দিব, তখন তার শরীর বজ্রের ন্যায় হইবে। যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তার শরীর অবশ্য

বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়। আমরা তো ছেলে-পিলের শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তাহাদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া ননীর পুতুল বানাইতেছি। অতিমাত্রায় আদর দিয়া সন্তানের শরীর বিগড়াইয়া দিতেছি।

ইহা তো হইল কাপড়ের কথা। বাড়ীতে নানারকম কথা বলিয়া তাহাদের মন খারাপ করিয়া দিতেছি। আমরা তাহাদিগকে বিবাহের কথা বলি, এবং এইরূপ ব্যাপার ও দৃশ্য তাহারা দেখে। আমি তো আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, আমরা কেন আরও বর্ব্বর হইয়া যাই নাই! নীতির বন্ধন নষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বে, ইহা রক্ষা পায়। ভগবান মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ধ্বংসের অনেক কারণ ঘটিলেও সে বাঁচিয়া যায়। তাঁর লীলা রহস্যময়। এইসব বাধা যদি আমরা দূর করিতাম, তবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা খুব সহজ হইত।

আমাদের অবস্থা এরূপ হওয়া সত্ত্বে আমরা দুনিয়ার সহিত শারীরিক বল-পরীক্ষায় নামিতে চাই। ইহার দুটি পথ আছে—একটি আসুরিক, অপরটি দৈবী। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য গোমাংস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য গ্রহণ করা, কুস্তি প্রভৃতি করা আসুরিক পথ। বাল্যকালে আমার এক মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে অবশ্য মাংসাহার করিতে হইবে, নহিলে ইংরেজের মত হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিব না। ভিন্ন দেশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জাপানেও গোমাংস খাওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। যদি আসুরিক উপায়ে শরীর তৈরী করিবার ইচ্ছা হয়, তবে এই সব জিনিষ খাইতে হইবে।

পরন্তু যদি দৈবী সাধনার পথে শরীর তৈরী করিতে চাই, তবে ব্রহ্মচর্য্যই তার উপায়। যখন আমাকে কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, তখন নিজের উপর আমার কৃপা হয়। মান-পত্রে আমাকে

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হইয়াছে। একথা বলা দরকার, যিনি মান-পত্রের মুসাবিদা করিয়াছেন তিনি জানেন না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে। যাহার সন্তান হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহা যায়? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তো কখনও জ্বর হয় না, মাথা ধরে না, আমাশয় ও এপেণ্ডিসাইটিস্ হয় না। ডাক্তারগণ বলেন, কমলাবাবুর রস অন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া গেলেও এপেণ্ডিসাইটিস্ হইতে পারে। যার শরীর নীরোগ, তার শরীরে এই জিনিষ থাকিতে পারে না। অন্ত্র শিথিল হইলে, এইসব জিনিষ আপনা হইতে বাহির হয় না। অন্ত্র শিথিল হইয়াছিল বলিয়া আমার এপেণ্ডিসাইটিস্ হইয়াছিল। যাহা সহজে হজম হয় না, ছেলেপিলে এমন জিনিষ অনেক খায়। মা তার খোঁজ রাখে কই? তবে তাহাদের অন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তি অনেক বেশী। আমি চাই আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া যেন কেহ মিথ্যাচারী না হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তেজ তো আমার অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হইবে। আমি আদর্শ ব্রহ্মচারী নহি। একথা সত্য যে, আমি এইরূপ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমি তো আপনাদের সামনে আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু পেশ করিলাম। ব্রহ্মচারী হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, কোনো স্ত্রীলোক অথবা আপনার ভগ্নীকে স্পর্শ করিব না। কাগজ স্পর্শ করিলে যেমন মনে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না, স্ত্রীলোক স্পর্শ করিলে ব্রহ্মচারীর তেমনি কোনো বিকার হইবে না। ভগ্নীর ব্যারামে তার সেবা করিতে গিয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়, তবে এই ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য তিন কড়া কড়ি। কোনো মৃত শরীর স্পর্শ করিয়া যেরূপ নির্ব্বিকার থাকিতে পারি, কোনো পরমা সুন্দরী যুবতীর শরীর স্পর্শ করিয়া সেইরূপ নির্ব্বিকার থাকিতে পারিলে আমরা ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী স্বভাবত সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরন্তু আমরা ইহার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছি। ফলে আমাদের গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থাশ্রম নষ্ট হইয়াছে এবং সন্ন্যাসাশ্রমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। আমাদের অবস্থা এত শোচনীয়!

উপরে যে আসুরিক পথের কথা বলিয়াছি, সে পথে চলিতে গেলে আপনারা পাঁচ শ বছর তক পাঠানদের* সহিত লড়াই করিতে সক্ষম হইবেন না। দৈবী পথে চলিলে, আজই তাহাদের সহিত লড়াই করিতে পারিবেন। কারণ দৈবী সাধন দ্বারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যেও প্রয়োজনীয় মানসিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে অনেক সময় দরকার। যখন আমাদের ভিতর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্য থাকিবে, এবং পিতামাতারা আমাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন, তখন আমরা দৈবীপথে চলিতে পারিব।

হিন্দী-নবজীবন—২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

* মহাত্মাজী বোধ হয় এখানে ভারতের বাহিরের পাঠানদের সহিত হিন্দু-মুসলমান সকলের বিরোধের কথা ইঙ্গিত করিতেছেন—অনুবাদক

সত্য বনাম ব্রহ্মচর্য্য

কোনো বন্ধু মহাদেও দেশাঈকে লিখিয়াছেন :—

"'আপনার স্মরণ হইতে পারে, কয়েক মাস পূর্ব্বে নবজীবনের একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, তিনি তখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন। ইহা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, এরূপ কথা প্রকাশ করার ফল কখনও ভাল হইতে পারে না। যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

"বিলাত-প্রবাস কালে আমার দুইটি বন্ধু ও আমি অনেক প্রকার প্রলোভন সত্ত্বে, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলাম। মদ মাংস ও স্ত্রীলোক হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলাম। কিন্তু গান্ধীজীর ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া, আমার এক বন্ধু সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বিপুল চেষ্টার পর গান্ধীজীর অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আমরা কি করিতে পারি? ব্রহ্মচর্য্যপালন করার চেষ্টা করা বৃথা। গান্ধীজীর ত্রুটি স্বীকার আমার সমস্ত ধারণা বদলাইয়া দিয়াছে। আজ হইতে আমি গোল্লায় গেলাম ধরিয়া লইও।' আমার মুখ মলিন হইল। সঙ্কোচের সহিত তাহাকে বলিলাম, 'গান্ধীজীর পক্ষেও এই পথে চলা যদি শক্ত হয়, তবে আমাদের পক্ষে আরও শক্ত। এজন্য আমরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চেষ্টা করিব।' আপনি এবং গান্ধীজীও বোধ হয় এইরূপ যুক্তি দেখাইতেন। কিন্তু এসবই বৃথা হইল। এ পর্য্যন্ত যে চরিত্র সুন্দর ও নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহা কলঙ্কিত হইল। যদি কেহ গান্ধীজীকে

এজন্য দায়ী করে, তবে গান্ধীজী অথবা আপনি ইহার কি জবাব দিবেন ?

"যত দিন পর্য্যন্ত আমি এই একটি ঘটনা জানিতাম, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আপনাকে কিছু লিখি নাই। তখন লিখিলে, আপনি হয়ত বলিতেন, একটি ঘটনা দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। কিন্তু ঐ লেখা বাহির হওয়ার পর, এইরূপ আরও ঘটনা দেখিয়া, আমার ধারণা যে ঠিক তাহাই মনে হইতেছে।

"জানি, গান্ধীজীর পক্ষে অনেক কাজ খুব সহজ হইলেও, আমার পক্ষে সে-সব অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের কৃপায় ইহাও সম্ভব হইতে পারে, যে-কাজ গান্ধীজী করিতে অক্ষম, সেইরূপ এক আধটা কাজ আমি করিতে পারি। গান্ধীজীর পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাহা আমার পক্ষে সাধ্য হইতে পারে, এই অভিমান আমাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য গান্ধীজীর স্বীকারোক্তি পড়িয়া আমার অন্তর বিলোড়িত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে নিরাপদে থাকিতে পারিব কিনা সন্দেহ হইতেছে।

"কৃপা করিয়া একথা এখন গান্ধীজীকে বলিবেন। বিশেষতঃ এ সময় তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতেছেন। খাঁটি সত্য বলায় বাহাদুরী আছে, কিন্তু 'নবজীবন' ও ইয়ং ইণ্ডিয়ার' পাঠকগণ এবং মানব জাতির পক্ষে ইহার ফল খারাপ হইবে। যাহা একের খাদ্য তাহা অন্যের পক্ষে বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইতে পারে।"

এই অভিযোগ নূতন নহে। অসহযোগ আন্দোলন জোরে চলিবার সময় যখন আমি আমার ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলাম, তখন কোনো বন্ধু সরলভাবে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার ভুল হইলেও তাহা স্বীকার করা উচিত হয় নাই। লোকের এ বিশ্বাস জন্মান

উচিত যে, অন্তত পক্ষে এমন একটি লোক আছেন, যিনি কখনও ভুল করেন না। লোকে আপনাকে সেইরূপ ভাবিত। আপনার ত্রুটি স্বীকারের জন্য তাহারা হতাশ হইবে।' এই পত্র পড়িয়া আমার হাসি কান্না দুইই আসিয়াছিল। লেখকের সরলতা দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। নিখুঁত লোক না মিলিলে, যাহার গলদ আছে এরূপ লোককে নিখুঁত বলিয়া চালাইতে হইবে এরূপ চিন্তায় আমাকে দুঃখ দিয়াছিল।

আমার ত্রুটী থাকিলে এবং তাহা লোকে জানিলে, তাহাদের ক্ষতির বদলে লাভ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তাড়াতাড়ি ত্রুটি স্বীকার করায় জনসাধারণের লাভ হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

আমার কুস্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। পূর্ণ ব্রহ্মচারী না হইয়াও যদি আমি ইহা দাবী করিতাম তবে ইহাতে দুনিয়ার বড় ক্ষতি হইত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য কলঙ্কিত এবং সত্যের জ্যোতি ম্লান হইত। ব্রহ্মচারী হওয়ার মিথ্যা দাবী করিয়া আমি কেন ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য কমাইব? এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আমি যে উপায় অবলম্বনের কথা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ নহে এবং সব ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে না, কারণ আমি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্মচারী নহি। দুনিয়া যদি আমাকে পূর্ণ ব্রহ্মচারী ভাবে এবং আমি যদি ব্রহ্মচর্য্য পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় দেখাইতে না পারি, তবে মহা অন্যায় হইবে।

আমি সদা জাগ্রত সাচ্চা সাধক; ব্রহ্মচর্য্য লাভের জন্য নিরন্তর দৃঢ়ভাবে কঠোর চেষ্টা করিতেছি। এইটুকু জানিলেই বা সকলে উৎসাহিত হইবে না কেন? মিথ্যা যুক্তি হইতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা

ঠিক নহে। যাহা কেহ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া জ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেন এরূপ বলা হয় যে, আমার মতন লোক কুচিন্তা হইতে যদি মুক্ত না হইতে পারে, তবে অপরে কি করিয়া পারিবে? এই গলদপূর্ণ তর্ক না করিয়া, ইহাই বলেন না কেন, যে-গান্ধী এককালে রিপুর দাস ও ব্যভিচারী ছিল, সেই গান্ধী যখন বর্ত্তমানে নিজের পত্নীর সহিত বন্ধু এবং ভাইএর ন্যায় বাস করিতে পারে, এবং অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী নারীকে কন্যা অথবা ভগ্নী মনে করিয়া তাহার সহিত নির্ব্বিকারচিত্তে একসঙ্গে থাকিতে পারে, তখন আমরাও কেন ইহা পারিব না? হীন মহাপাতকীরও উদ্ধারের আশা আছে আমার কুচিন্তা ভগবান দূর করিবেন, ইহাই হইল সোজা হিসাব।

লেখকের যে মিত্রেরা আমার গলদের কথা শুনিয়া পিছনে হটিয়াছেন ভাবিতেছেন, তাঁহারা কখনও অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা সামান্য আঘাতেই নষ্ট হইয়াছে; সাচ্চা ব্রহ্মচর্য্যসাধন এবং এইরূপ মহান্ ব্রতপালন আমার ন্যায় অসম্পূর্ণ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। তাহার পিছনে অসংখ্য লোকের কঠোর তপশ্চর্য্যা এবং আদর্শ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সাধনা রহিয়াছে।

এই সব আদর্শ মানবের পংক্তিতে দাঁড়াইবার অধিকার যখন আমার হইবে, তখন আমার ভাষার দৃঢ়তা ও শক্তি আরও বাড়িবে। যিনি কখনও কোনো খারাপ চিন্তা করেন না, যাঁর চিন্তা সংযত, যিনি স্বপ্ন দেখেন না, যিনি নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান। তাঁহার কুইনাইন সেবন করা দরকার হয় না। নির্ব্বিকারীর রক্ত এরূপ শুদ্ধ যে, তাঁহার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর মন ও আত্মা লাভের জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। ইহার ভিতর পরাজয় বা

বিফলতার কোনো কথা নাই। এই চেষ্টায় যোগ দিবার জন্য আমি পত্রলেখককে, তাঁহার বন্ধুদিগকে এবং অপর সকলকেও অনুরোধ করিতেছি এবং ইচ্ছা করি, লেখকের ন্যায় তাঁহারাও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। যাঁহারা পিছনে পড়িয়া আছেন, তাঁহারা আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেন আত্মবিশ্বাসী হন। আমার দুর্ব্বলতা এবং ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়া সত্ত্বে, নিরন্তর চেষ্টা এবং ভগবানের করুণায় অনন্ত বিশ্বাসের ফলে, আমি সামান্য সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এজন্য কেহ যেন নিরাশ না হন। আমার 'মহাত্মা' হওয়ার কোনো অর্থ নাই। আমার বাহিরের কাজের জন্য—রাজনৈতিক কাজের জন্য, আমি ইহা পাইয়াছি। ইহা ক্ষণস্থায়ী। সত্য, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি নিষ্ঠা আমার অন্তরতম জিনিষ—ইহাই আমার অবিচ্ছিন্ন জিনিষ। ইহা অল্প হইলেও অনাদরের জিনিষ নহে। এ সম্বন্ধে আমি ভগবানদত্ত যাহা-কিছু পাইয়াছি, ভুল করিয়াও তাহার প্রতি যেন কেহ অবজ্ঞা না দেখান—কারণ ঐ অল্পই আমার যথাসর্ব্বস্ব। এই সম্পর্কে আমার অকৃতকার্য্যতা ও ভ্রমপ্রমাদকেও আমি সফলতার চাবি মনে করি; ইহার জন্য নিষ্ফলতাও আমার প্রিয়।

হিন্দী-নবজীবন, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

পবিত্রতা

ব্রহ্মচর্য্য এবং ইহা প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্য আমার নিকট অসংখ্য চিঠি আসিতেছে। পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি অথবা লিখিয়াছি, নূতন ভাবে তাহার পুনরালোচনা করিব। কলের ন্যায় শরীর সংযম করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে না। ইহার অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণসংযম—কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়বিকার হইতে মুক্তি। এই হিসাবে ইহা আত্ম-দর্শন বা ভগবদ্প্রাপ্তির পাকা সড়ক। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি অথবা সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছার সহিত ব্রহ্মচারীকে আদৌ লড়িতে হয় না; ইহা তাঁহাকে মোটেই জ্বালাতন করে না। সারা দুনিয়া তাঁর নিকট এক বিশাল পরিবারের ন্যায় ঠেকে। মানবের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার সব উচ্চাশাকে কেন্দ্রীভূত করেন। সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হয়। যিনি মানবসমাজের বিশালতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ের দাস হন না। তিনি সহজাত সংস্কাররূপে আপনার শক্তির উৎস কোথায় তা জানেন এবং ইহাকে নিষ্কলঙ্ক রাখার জন্য সব সময় চেষ্টিত থাকেন। জগৎ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিকে সম্মান করে। দণ্ডধারী রাজা অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব বেশী।

কিন্তু আমাকে বলিতে পারেন, এই আদর্শে পৌছান অসম্ভব এবং স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার স্বাভাবিক আকর্ষণকে আমি হিসাবে ধরি নাই। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে, স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার এই আকর্ষণ স্বাভাবিক; ইহা সত্য হইলে বুঝিব প্রলয়ের বেশী দেরী নাই। ভাই বোন, মাতা পুত্র ও পিতা পুত্রীর ভিতর যে আকর্ষণ আছে, তাহাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই দুনিয়াকে রক্ষা করিতেছে। সমস্ত নারীজাতিকে আমি যদি ভগ্নী, কন্যা অথবা মায়ের ন্যায় ভাবিতে না পারিতাম, তবে কাজ করাতো দূরের কথা বাঁচিয়া থাকাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। যদি কাম দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইতাম তবে ইহা সুনিশ্চিতরূপে আমাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইত।

সন্তানোৎপাদন স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। এই সীমা লঙ্ঘন করিলে নারীকে বিপন্ন ও সমাজকে শক্তি-হীন করা হয়। ইহা ব্যাধি সৃষ্টি করে, পাপকে চিত্তাকর্ষক করে এবং দুনিয়াকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায়। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির অবস্থা হালশূন্য জাহাজের ন্যায়। এইরূপ কোনো লোক যদি সমাজকে চালাইতে যায়, গাদাগাদা বই লেখে, এবং লোকে যদি তাহার কথা-মত চলে, তবে সমাজের অবস্থা শোচনীয় হয়। তথাপি ঠিক এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের চিন্তায় তন্ময় হইয়া আলোকের চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে পোকার যে অবস্থা হয়, ক্ষণিক সুখের আশায় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির পথে চলিতে চলিতে আমাদেরও সেই দশা হইবে। আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিব, স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার যৌন আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক। মনকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করা এবং দম্পতিকে ভগবানের নিকট লইয়া যাওয়াই

বিবাহের উদ্দেশ্য! স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র কামগন্ধহীন প্রেম থাকা অসম্ভব নহে। মানুষ পশু নহে। অসংখ্য পশুযোনি ভ্রমণ করার পর, সে উচ্চস্তরে উঠিয়াছে। তাহাকে চারি পায়ে ভর দিয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয় না, সে দাঁড়াইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জড় ও আত্মায় যে প্রভেদ, পশুত্ব ও মনুষ্যত্বে সেই প্রভেদ।

পরিশেষে ব্রহ্মচর্য্য লাভের উপায় সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বলিব।

ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাই প্রথম সোপান।

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীকে রসনেন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে। তিনি বাঁচিয়া থাকার জন্য খাইবেন, ভোগের জন্য নহে। তিনি শুধু পবিত্র জিনিষ দেখিবেন, এবং অপবিত্র কিছু দেখিলে চোখ বুজিবেন। এদিক ওদিক না তাকাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলাই সুশিক্ষার চিহ্ন। তিনি কোনো কু অথবা অপবিত্র কথা শুনিবেন না; কোনো উগ্র বা উত্তেজক জিনিষের গন্ধ লইবেন না। পরিষ্কার মাটির গন্ধ, কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্য অথবা গন্ধসার অপেক্ষা অনেক মধুর। যিনি ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছুক, তিনি যেন সব সময় নিজের শরীরকে স্বাস্থ্যপ্রদ কাজে নিযুক্ত রাখেন, এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসও করেন।

তৃতীয় উপায় সৎসঙ্গী ও সৎবন্ধুর সহিত থাকা এবং সৎগ্রন্থ পাঠ।

শেষ উপায় উপাসনা। ইহার মূল্য কোনোটির অপেক্ষা কম নহে। ব্রহ্মচারী যেন সর্ব্বান্তকরণে প্রত্যেক দিন নিয়মিতরূপে ভগবানের নাম করেন ও তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন।

স্ত্রী-পুরুষ কাহারও পক্ষে ইহার কোনোটা পালন করা শক্ত নহে। এগুলি সহজসাধ্য। কিন্তু সহজ বলিয়াই মুস্কিলে পড়িতে হয়। সঙ্কল্প থাকিলে, উপায় সহজে বাহির হয়। লোকে ইহা চায় না, সে জন্য অন্ধকারে বৃথা হাতড়াইয়া বেড়ায়। অল্পবিস্তর ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম রক্ষার উপর যখন জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন বলা চলে ইহা প্রয়োজনীয় এবং পালন করাও সম্ভবপর।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৯ এপ্রিল, ১৯২৬

এইরূপ বিষয় প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতেছি বলিয়া পাঠকগণ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। গোপনে ইহা আলোচনা করিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু বাধ্য হইয়া আমি যে-সাহিত্য পাঠ করিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত বুরো* সাহেবের পুস্তক সমালোচনার পর আমি যে-সব চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে সমাজের এই পরম হিতকর প্রশ্ন প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এক মালাবারী ভাই লিখিতেছেন :—

"শ্রীযুক্ত বুরোর বই সমালোচনার সময় আপনি লিখিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য বা দীর্ঘকাল সংযম পালন করার ফলে কাহারও কোনো ক্ষতি হইয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত নাই। তিন সপ্তাহের বেশী সংযম পালন করা আমার পক্ষে অনিষ্টকর মনে হয়। তিন সপ্তাহ পরে আমার শরীর প্রায়ই ভার ঠেকে, মন ও শরীর চঞ্চল হয় এবং মেজাজও একটু বিগড়াইয়া যায়। সম্ভোগ দ্বারা অথবা অনিচ্ছাপ্রসূত বীর্য্যপাত হইলে আরাম পাই। পরদিন প্রাতে শরীর ও মন দুর্ব্বল না হইয়া শান্ত ও হালকা হয় এবং বেশী উৎসাহের সহিত আমার নিয়মিত কাজ করিতে পারি।

"সংযমই আমার এক বন্ধুর যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। তাঁহার

* M, Paul Bureau নামক ফরাসি লেখকের একখানা বইএর ইংরেজী অনুবাদের (Towards Moral Bankruptcy) সমালোচনা গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় করেন। সেই সব লেখার অনুবাদ এবং মহাত্মাজী কর্তৃক সংগৃহীত আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ তরুণ-সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত 'দুর্নীতির পথে' নামক পুস্তকে পাইবেন—অনুবাদক।

বয়স বত্রিশ বৎসর। তিনি নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। সব রকম শারীরিক অথবা মানসিক কু অভ্যাস হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তথাপি স্বপ্নদোষ হইয়া তাঁহার বহুত বীর্য্যপাত হইত। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। শেষে তাঁহার তলপেটে ভয়ানক বেদনা পর্য্যন্ত হয়। ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। এক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বিবাহ করেন। এখন সম্পূর্ণ ভাল আছেন।

"আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ ব্রহ্মচর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে—একথা আমি বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ধারণা করিতে পারি। কিন্তু উপরে বর্ণিত অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, শুক্রগ্রন্থি হইতে যে বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হজম করিয়া শরীরের ভিতর রাখিবার শক্তি আমাদের নাই। এজন্য ইহা বিষের মত কার্য্য করে। অতএব আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংযমের মূল্য সম্বন্ধে যাহাদের সন্দেহ নাই, সেরূপ আমার মতন লোকের সুবিধার জন্য হঠযোগ অথবা প্রাণায়ামের মত কোনো সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলুন। ইহার সাহায্যে আমরা শরীরের এই প্রাণ-শক্তিকে রক্ষা করিতে পারিব।"

পত্রলেখকের দৃষ্টান্তগুলি অসাধারণ নহে। অনেকের জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ ঘটনা হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখিয়াছি। প্রাণশক্তি শরীরের ভিতর রাখা ও হজম করা বহু সময় ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কারণ ইহা শরীর ও মনকে যত শক্তিশালী করে, তাহা আর কিছুতেই পারে না। ঔষধপত্রাদি শরীরকে সাধারণ অবস্থায় রাখিতে পারে, কিন্তু ইহাতে চিত্তের দুর্ব্বলতা এত বাড়ে যে,

মন ইন্দ্রিয়ের সহিত লড়াই করিতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সব ইন্দ্রিয় মারাত্মক শত্রুর ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে।

আমরা অনেক সময় এরূপ কাজ করি, যাহাতে আমাদের উপকার না হইয়া অপকারই বেশী হয়। তথাপি আমরা ভাল ফল চাই। আমাদের জীবনযাপন প্রণালী এরূপ যাহাতে সহজে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। আমাদের ভোজন, সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ, কাজকরার সময় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, এইগুলি আমাদের পাশবিক বাসনার উত্তেজনা ও খোরাক যোগায়। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের ইচ্ছা বিবাহ করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং খুব পরিমিত হইলেও সুখভোগ করা। আখের তক এই ব্যাপার কমবেশী চলিবে।

কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম চিরকালই থাকে। এমন লোকও দেখা গিয়াছে, যাঁহারা মানবজাতি অর্থাৎ ভগবানের সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র মানব সমাজ ও নিজের পরিবারের সেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখিতে চান না। ইঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উপযোগী জীবন যাপন করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের সেবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শৈথিল্য ত্যাগ এবং কঠোর সংযমের ভিতর সুখের সন্ধান করিতে হইবে। তাঁহারা দুনিয়ায় থাকিবেন, কিন্তু দুনিয়ার পথে চলিবেন না। তাঁহাদের খাদ্য, কাজ, কাজের সময়, আমোদ-প্রমোদ, সাহিত্য, জীবনের উদ্দেশ্য অপর সাধারণ হইতে বিভিন্ন প্রকার হইবে।

এখন দেখিতে হইবে, পত্রলেখক ও তাঁহার বন্ধু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কি না, এবং নিজেদের জীবনকে সেই পথে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে একথা বুঝা শক্ত নহে, কেন বীর্য্যপাতের ফলে প্রথম ব্যক্তির আরাম ও

দ্বিতীয় ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে বিবাহই ছিল প্রতিকারের উপায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন যদি বিবাহ-সুখের চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তবে এ অবস্থায় অধিকাংশ মানুষের বিবাহ করাই ঠিক। যে চিন্তাকে সংযত করা যাইতেছে না, অথচ যাহাকে মূর্ত্ত করা হয় নাই, তার শক্তি, যে চিন্তাকে মূর্ত্ত এবং কাজে পরিণত করা হইয়াছে, তার অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজকে যথোচিত সংযত করা হইলে, চিন্তার উপর ইহার প্রভাব পড়ে এবং ইহা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কার্য্যে পরিণত হইলে চিন্তার অবস্থা হয় কয়েদীর মত—তখন চিন্তা আয়ত্তাধীন হয়। এই হিসাবে বিবাহ এক প্রকার সংযম।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংযত জীবন যাপন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য খবরের কাগজের প্রবন্ধে আমি খুঁটিনাটি পরামর্শের কথা লিখিতে পারি না। এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখা আমার **'স্বাস্থ্যনীতি'** তাঁহাদিগকে পড়িতে বলি। নূতন অভিজ্ঞতা অনুসারে ইহার কয়েক স্থান পুনর্লিখিত হওয়া উচিত, কিন্তু ইহার ভিতর এমন কিছু নাই, যাহা আমি বাদ দিতে ইচ্ছা করি। সাধারণ নিয়মগুলি নীচে দিতেছি।

(১) পরিমিত ভোজন করিবে। অল্প ক্ষুধা থাকিতেই খাওয়া ছাড়িয়া উঠিবে।

(২) বেশী গরম মশলা এবং ঘৃত-তৈল যুক্ত নিরামিষ খাদ্যও ত্যাগ করিবে। যথেষ্ট দুধ মিলিলে, ঘৃত তৈল প্রভৃতি চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যখন জীবনীশক্তির অল্প অপব্যয় হয়, তখন অল্প আহারই যথেষ্ট।

(৩) পবিত্র কাজে মন ও শরীরকে নিযুক্ত রাখিবে।

(৪) সকালে ঘুম হইতে উঠিবে এবং সকালে শুইবে।

(৫) সর্ব্বোপরি, সংযত জীবন কাটাইতে হইলে, ভগবদপ্রাপ্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। যখন এই পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়, তখন হইতে ভগবানের উপর এই নির্ভরতা আসে যে, তিনি নিজে মানুষকে পবিত্র ও কর্ম্মশীল রাখেন।

গীতায় আছে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনং।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

'উপবাস সত্ত্বে ইন্দ্রিয় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। কিন্তু পরম পদার্থ ভগবানকে দেখিলে, বিষয়-বাসনা চলিয়া যায়।' ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পত্রলেখক আসন ও প্রাণায়ামের কথা বলিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, আত্মসংযম অভ্যাস করার পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যাহা আছে তাহা লেখার যোগ্য নহে। যতটুকু আমি জানি, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত কোনো বই এই বিষয়ে নাই। ইহা গবেষণা-যোগ্য। কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকদিগকে ইহা প্রয়োগ করিতে, অথবা যে-কোনো হঠযোগীর সাক্ষাৎ পাইলেই, তাহাকে গুরু বলিয়া মানিয়া তার নিকট পরামর্শ লইতে আমি নিষেধ করি। তাহারা নিশ্চিন্ত ভাবে জানিয়া রাখুন, সংযত ও ধর্ম্মজীবন যাপন করাই অভিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য পালন করার পক্ষে যথেষ্ট।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

আত্ম-কথা

এখন আসিল ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভাবনা। বিবাহের সময় হইতে আমার হৃদয়ে এক-পত্নী-ব্রত স্থান পাইয়াছিল। আমার সত্যব্রতের এক অঙ্গই ছিল পত্নীর প্রতি বিশ্বস্ততা। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করার গুরুত্ব আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝি। আমার ঠিক ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কি প্রসঙ্গে অথবা কোন পুস্তক পাঠে আমার এ চিন্তা আসে। তবে মনে পড়িতেছে এই সম্বন্ধে রায় চাঁদ ভাইএর প্রভাব আমার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল।

তাঁহার একটি কথা মনে আছে। এক সময় আমি শ্রীযুক্ত গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতি শ্রীমতী গ্ল্যাডষ্টোনের প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বড় প্রশংসা করি। আমি বলিয়াছিলাম, পার্লামেণ্টের বৈঠকেও শ্রীমতী গ্ল্যাডষ্টোন স্বামীর জন্য চা তৈরী করিয়া দিতেন। এই দম্পতির পক্ষে ইহাও এক দস্তুর হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাঁহাকে ইহা পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেমের প্রশংসা করিয়াছিলাম। রায়চাঁদ ভাই বলিয়াছিলেন, 'ইহার ভিতর প্রশংসার কি দেখলে তুমি? শ্রীমতী গ্ল্যাডষ্টোনের পাতিব্রত্য ও সেবাবৃত্তি, এর মধ্যে কোনটার প্রশংসা কর? কিন্তু ঐ মহিলা যদি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য অথবা ভগ্নী হতেন, এবং তাঁকে ঐ ভাবে সেবা করতেন, তবে তুমি কি বলতে? এরূপ কোনো ভৃত্য পাওয়া যায়

না কেন ? কোনো পুরুষের ভিতর এইরূপ প্রেম দেখলে তোমার আনন্দ ও বিস্ময় হয় না কেন ? আমি যা বল্লাম তা ভেবে দেখো।"

রায় চাঁদ ভাই বিবাহিত ছিলেন। আমার মনে পড়িতেছে, সেই মূহূর্ত্তে তাঁহার কথাগুলি আমার নিকট বড় কঠোর ঠেকিয়াছিল। কিন্তু আমি ইহা কখনও ভুলিতে পারি নাই। স্ত্রীর পতিভক্তি অপেক্ষা ভৃত্যের প্রভুভক্তি যে হাজারগুণ প্রশংসনীয়, তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। পতি-পত্নীর ভিতর অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, এ জন্য তাহাদের মধ্যে প্রেম থাকা আশ্চর্য্যজনক নহে। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে এইরূপ প্রেম জন্মা খুব শক্ত। কবি রায় চাঁদের কথা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করিলাম, 'পত্নীর সহিত কি সম্বন্ধ রাখিব ? পত্নীকে বিষয়-ভোগের বস্তু বানাইলে তার সহিত বিশ্বস্ততা থাকিল কই ? যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়-বাসনার অধীন থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বস্ততার কি মূল্য আছে ?' একথা বলা উচিত মনে করিতেছি যে, আমার পত্নী কখনও আমাকে প্রলুব্ধ করেন নাই। এজন্য আমিই সঙ্কল্প করিতে পারিলে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করা খুব সহজ ছিল। আমার দুর্ব্বলতা বা কামেচ্ছা আমার বাধা স্বরূপ ছিল।

বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার পরেও আমি অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার এই চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। এই উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-নিগ্রহ। বিলাতে থাকিতে আমি এই সম্বন্ধে কিছু পড়িয়াছিলাম। নিরামিষ-আহার অধ্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ডাক্তার এলিসনের কথা বলিয়াছি। ইহা আমার উপর কিছু সাময়িক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত হিল্‌স্ সাহেব ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন। সাধনা এবং সংযম দ্বারা কিরূপে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় তিনি তাহা

প্রচার করেন। ইহার প্রভাবও আমার উপর পড়ে। যখন বুঝিলাম, আমি আর সন্তান চাহি না, তখন হইতে সংযমী হইবার জন্য চেষ্টা সুরু করিলাম।

সংযম পালন করিতে গিয়া মুস্কিলের অবধি ছিল না। আমরা পৃথক বিছানায় শোয়া আরম্ভ করিলাম। সমস্ত দিনের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শয়নের বন্দোবস্ত করিতাম। এই সব চেষ্টায় খুব শীঘ্র ফল পাইয়াছিলাম মনে হয় না। কিন্তু এখন অতীতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি যে, এইরূপ বিফল চেষ্টাই আমাকে শেষকালে বল দিয়াছিল।

১৯০৬ সালে শেষ সঙ্কল্প করিলাম। তখনও সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। স্বপ্নেও ইহার কথা ভাবি নাই। বুয়ার যুদ্ধের পর নাটালে জুলুবিদ্রোহ হয়। তখন আমি জোহান্নিস্‌বার্গে ব্যারিষ্টারী করিতাম। মনে হইল, এই সময় আমাদের নাটাল-সরকারের সাহায্য করা দরকার। আমি সরকারকে ইহা জানাইলাম। সরকার রাজী হইলেন। সে কথা পরে বলিব। এই সেবার সময় সংযম সম্বন্ধে আমার জবর ভাবনা আসে। সাথীদের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিলাম। আমার দৃঢ় ধারণা হইল, সন্তানোৎপাদন ও সন্তান-পালন দেশ-সেবার বিরোধী। আমাকে জোহান্নিসবার্গের গৃহস্থালী উঠাইতে হইল। এক মাসের ভিতর ঐ সাজান ঘর আমাকে ছাড়িতে হইল। পত্নী ও বালকদিগকে ফিনিক্সে রাখিলাম এবং ভারতীয় সেবক দল লইয়া নাটাল সৈন্যদলের সহিত চলিলাম। কঠোর কুচ-কাওয়াজ করার সময়, হঠাৎ চিন্তা আসিল, তন্ময় হইয়া লোকসেবা করিতে চাহিলে সন্তান-সন্ততি ও অর্থপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে হইবে এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে।

দেড় মাসের বেশী এই কাজে থাকিতে হয় নাই। কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় এই ছয় সপ্তাহ। ব্রতের মহত্ত্ব আমি এই সময় স্পষ্টভাবে বুঝিলাম। দেখিলাম ব্রত স্বাধীনতার দ্বার, বন্ধনের দ্বার নহে। এ পর্য্যন্ত আমি কৃতকার্য্য হই নাই, তার কারণ আমার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল না, আমার নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না, ভগবানের করুণায়ও আমি বিশ্বাস করিতাম না। এজন্য আমার চিত্তবিকার হইত। আমি বুঝিলাম, যে ব্যক্তি ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ নহে সে মোহপাশ কাটিতে পারে না। ব্যভিচার ত্যাগ করিয়া এক পত্নীর সহিত সম্বন্ধ রাখা ব্যাপারটি যেমন, ব্রত গ্রহণ করিযা সংযমী হওয়ার চেষ্টা করাও তেমন। 'আমি পুরুষকারে বিশ্বাস করি কিন্তু ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাই না'—ইহা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির কথা। ইহার ভিতর সূক্ষ্মরূপে ভোগবাসনা লুক্কায়িত আছে। যাহা ত্যাগ করার যোগ্য, তাহা সব সময়ের জন্য ত্যাগ করায় হানি কি? যে সাপ আমাকে কাটিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই ত্যাগ করি; ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হই না। আমি জানি, শুধু চেষ্টায় মৃত্যু ঠেকাইবে না। খালি চেষ্টা করিব বলিলে বুঝা যায়, সাপের বিষের অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অল্প আছে। যে বস্তু ত্যাগ করার চেষ্টামাত্র করিয়া আমি সন্তুষ্ট, সে বস্তু ত্যাগ করা যে প্রয়োজন, তাহা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি নাই। 'যদি আমার মত ভবিষ্যতে বদলাইয়া যায় তবে কিরূপে শপথ গ্রহণ করিব?' এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা অনেক সময় ব্রত গ্রহণ করিতে ভয় পাই। এজন্য নিস্কুলানন্দ কহিয়াছেন—

'ত্যাগ ন টকে রে বৈরাগ বিনা।'

বৈরাগ্য বিনা ত্যাগ স্থায়ী হয় না। যাহার কোনো বিষয়ে

পূর্ণ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে তার পক্ষে ব্রত বা শপথগ্রহণ করা অনিবার্য্য বিধান।

ভালভাবে আলোচনা ও পাকাপাকি চিন্তার পর ১৯০৬ সালে আমি ব্রত গ্রহণ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আমি স্ত্রীকে কিছুই জানাই নাই, কিন্তু ব্রত লইবার সময় তাঁহার সহিত আলোচনা করি। তিনি কোনো বাধা দিলেন না।

এই সময় ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। আমার শক্তি ছিল কম। কিরূপে আমি ইন্দ্রিয় দমন করিব? স্ত্রীর সহিত কাম সম্বন্ধ ত্যাগ করা আমার নিকট নূতন ঠেকিল। তথাপি আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইহাই আমার কর্ত্তব্য। আমার উদ্দেশ্য মহৎ—ভগবান শক্তি দিবেন ভাবিয়া আমি ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

বিশ বৎসর পরে সেই ব্রতের কথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইতেছে। ১৯০১ সাল হইতে আমার সংযম পালনের ইচ্ছা প্রবল হয়, এবং তখন হইতে আমি ইহা অল্প বিস্তর পালন করিতেছিলাম; কিন্তু ১৯০৬ সালে যে স্বতন্ত্রতা-সুখ অনুভব করিলাম, তাহা পূর্ব্বে কখনও করি নাই। কারণ ইহার পূর্ব্বে আমি বাসনাবদ্ধ ছিলাম, যখন-তখন ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতাম। এখন হইতে ব্রতই আমাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা আমি বেশী বেশী বুঝিতে লাগিলাম। ফিনিক্সে থাকিতে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহত-সেবার কাজ হইতে ছুটী পাইয়া ফিনিক্সে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আমাকে শীঘ্রই জোহান্নিসবার্গে যাইতে হইল। সেখানে যাওয়ার এক মাসের ভিতর সত্যাগ্রহের বুনিয়াদ পত্তন হইল। কে জানে ব্রহ্মচর্য্য আমাকে এই কাজের উপযোগী করিয়া গড়িতেছিল কি না! সত্যাগ্রহের কথা আমি

পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। ইহা অনায়াসে অনিচ্ছায় আসিয়া পড়িল। কিন্তু আমি দেখিলাম, ইহার পূর্ব্বেকার ঘটনায় আমাকে এই আদর্শের দিকে লইয়া আসিয়াছে। ফিনিক্সে যাওয়া, আমাকে আদর্শে পৌঁছিবার উপযোগী করিয়াছিল।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনই ব্রহ্মদর্শন। এ জ্ঞান আমার শাস্ত্রপাঠে হয় নাই। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে ধীরে ধীরে লাভ হইয়াছে! ব্রত লওয়ার পর, দিন দিন আমার এই জ্ঞান হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীর মন ও আত্মা রক্ষা হয়। এখন হইতে ব্রহ্মচর্য্যকে কঠোর তপস্যার ন্যায় ঠেকিত না, ইহা আনন্দ শান্তি ও তৃপ্তি দান করিত। এ জন্য আমি প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য্যের নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতাম।

কিন্তু একথা যেন সকলে মনে রাখেন যে, যদিও আমি ইহা পালন করিয়া বেশী বেশী আনন্দ পাইতাম, তথাপি ইহা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ছাপ্পান্ন বৎসর পার হইয়া এখনও বুঝিতেছি, ইহা কত শক্ত। আমি ক্রমশঃ বুঝিতেছি, এই ব্রত পালন করা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলার ন্যায় কঠিন। এ জন্য নিরন্তর সজাগ থাকিতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম লোভ দমন করিতে হইবে। নিজে দেখিয়াছি, রসনেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অতিশয় সহজ হয়। এজন্য ঐ সময় হইতে কেবল নিরামিষাশীরূপে নহে, ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতেও আহার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। খাদ্য পরিমিত, সাদাসিধে, মশলাহীন ও সম্ভব হইলে কাঁচা হওয়া চাই। আমি এসব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

ছয় বৎসর পরীক্ষার পর বুঝিয়াছি টাটকা ফল ও বাদাম ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খোরাক। যখন আমি শুষ্ক অথবা পাকা ফল খাইয়া থাকিতাম,

তখন যেরূপ নির্ব্বিকার থাকিতে পারিতাম, খোরাক বদলাইলে সেরূপ থাকিতে পারি নাই। ফলাহার করার সময় ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহজ ছিল, দুগ্ধপানের সময় আমাকে এজন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত। ফলাহার ছাড়িয়া আবার দুধ ধরিলাম কেন, তাহা উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হইবে। এখানে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে দুধ বিঘ্নস্বরূপ। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, ব্রহ্মচারী মাত্রকেই দুধ ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের উপর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের কিরূপ প্রভাব পড়ে, তাহা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করা দরকার। দুধের মত পেশী-নির্ম্মাতা ও এরূপ সহজপাচ্য কোনো ফলের সন্ধান আজ তক পাই নাই। কোনো ডাক্তার কবিরাজ হেকিমও ইহা বলিতে পারেন নাই. এজন্য দুধকে উত্তেজক জানিয়াও কাহাকেও ইহা ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতে পারি না।

খাদ্য নির্ব্বাচন ও ইহার পরিণাম নির্দ্ধারণের ন্যায় উপবাসও ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্যিক সহায়তাকারী। ইন্দ্রিয় এরূপ বলবান যে, তাহাদিগকে চারিদিক হইতে নিগ্রহ করিলেও সূক্ষ্মাকারে ইহা থাকিয়া যায়। একথা সকলে জানেন যে, ইন্দ্রিয়সকল আহার্য্য বিনা শক্তিহীন হয়। এজন্য সংযমের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত উপবাসে ইন্দ্রিয়দমনের সাহায্য করে। কতলোকে উপবাস করিয়াও কোনো ফল পায় না। তাহারা ভাবে তাহারা খুব উপবাস করিতে পারে। তাহারা বাহ্যিক উপবাস করে, কিন্তু মনে মনে ছাপ্পান্ন প্রকার জিনিষ ভোগ করে; তাহারা পরে কি খাইবে কি পান করিবে, উপবাসের সময় তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকে। এরূপ উপবাস দ্বারা লোভ অথবা কাম কিছুই দমন হয় না। মানুষের মন যখন ইন্দ্রিয় দমনের সহায়তা করে তখনই উপবাসে উপকার করে।

বিষয়ভোগের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া চাই। মনই সমস্ত বিষয়বাসনার মূল। উপবাসে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু উপবাসকারী লোকও ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারে। উপবাস ভিন্ন বিষয়বাসনার মূল নষ্ট করা আমার নিকট অসম্ভব ঠেকে। এজন্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে উপবাস অপরিহার্য্য। অনেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হয়, কারণ খানাপিনা প্রভৃতি বিষয়ে অব্রহ্মচারীর মতন থাকিয়াও তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনের ইচ্ছা করে। গরমের দিনে শীতকালের ঠাণ্ডা অনুভব করার চেষ্টার ন্যায়, তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়। সংযমী ও স্বেচ্ছাচারী, যোগী ও ভোগীর জীবনের ভিতর স্পষ্ট পার্থক্য থাকিবে। তাহাদের মধ্যে যে মিল, তাহা কেবল বাহ্যিক। এই ভেদ সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে হইবে। দু' জনই চোখ দিয়া দেখে; কিন্তু ব্রহ্মচারী ভগবানের মহিমা দর্শন করে, এবং ভোগী নাচ তামাসা দেখিতে মত্ত থাকে। উভয়েই কাণের ব্যবহার করে; কিন্তু একজন শোনে ঈশ্বর-ভজন আর একজন শোনে বিলাস-সঙ্গীত। দু' জনেই অনেক সময় রাত্রি জাগরণ করে; কিন্তু একজন এই সময় হৃদয় মন্দিরে অবস্থিত ভগবানের প্রার্থনা করে, আর একজন রঙ্গরস নৃত্যগীতে মত্ত থাকিয়া ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়। দু' জনেই ভোজন করে। কিন্তু একজন দেহ-মন্দিরকে ঠিক রাখার জন্য আহার করে, আর এক জন জিহ্বার তৃপ্তির জন্য নানারকম জিনিষ দিয়া উদর পূর্ণ করে এবং শরীরকে দুর্গন্ধযুক্ত নর্দামার মতন করিয়া ফেলে। দু' জনের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ, ইহা বাড়িবে বই কমিবে না।

কায়মনোবাক্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য্য। আমি প্রত্যহ ক্রমশঃ বুঝিতেছি, ইহার জন্য উপরোক্ত উপায়ে সংযমের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ত্যাগের যেরূপ সীমা নাই, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরও সীমা নাই।

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য অল্প চেষ্টায় লাভ হয় না। কোটি কোটি লোকের পক্ষে ইহা তো আদর্শরূপেই থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা নিজের ত্রুটীর দিকে নজর রাখিবেন, আপনার অস্থি-মজ্জার ভিতর লুক্কায়িত বিকার-ভাব ও ইন্দ্রিয় সকলকে চিনিয়া রাখিবেন, এবং সে সব দূর করার জন্য চেষ্টা করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত চিন্তা ইচ্ছাশক্তির বশে না আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসম্ভব। অনিচ্ছা-প্রসূত চিন্তা মনের বিকার। মনকে বশে রাখিতে পারিলে, চিন্তাও বশীভূত হইবে। বায়ুকে বশ করা অপেক্ষা মনকে বশ করা কঠিন। কেহ যেন মনে না করেন, ইহা অসম্ভব। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, এবং এই আদর্শে পৌছিবার জন্য যে বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

দেশে আসিয়া আমি বুঝিয়াছি, এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য কেবল মানবীয় চেষ্টায় লাভ হয় না। এ পর্য্যন্ত আমার এক ভুল ধারণা ছিল; আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম, ফলাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করা যায় এবং অভিমান বশে ভাবিতাম, আমার আর কিছু করার দরকার নাই।

কিন্তু এ সব কথা পরে আলোচিত হইবে। আমি স্পষ্ট বলিয়া রাখি, যাঁহারা ভগবদপ্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন হতাশ না হন। অবশ্য নিজেদের চেষ্টার উপর তাঁহাদের যতখানি বিশ্বাস আছে, ভগবানের উপর তাঁহাদের ততখানি বিশ্বাস থাকা চাই।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

নিরাহারীর বিষয়-তৃষ্ণা শান্ত থাকে, কিন্তু রস (বিষয়-ভোগেচ্ছা) থাকিয়া যায়। রসও ঈশ্বরদর্শন দ্বারা শান্ত হয়। সে জন্য ভগবানের নাম ও ভগবানের করুণা মোক্ষকামীর শেষ অবলম্বন। হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসার পর আমি এই সন্ধান পাই।

হিন্দী-নবজীবন ২০ ও ২৭ জানুয়ারী, ১৯২৭

জন্ম-নিরোধ

যথেষ্ট সঙ্কোচ এবং অনিচ্ছার সহিত আমি এই বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি। ভারতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমি অনেক চিঠি পাইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে এই বিষয় আলোচনা করি নাই। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একজন পবিত্রতাবাদী ও একজন ডাক্তারের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হয়; পবিত্রতাবাদী প্রাকৃতিক উপায়ে সন্তান-নিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী। জীবনের সেই প্রথম অবস্থায়, কিছুদিন আমি কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম; কিন্তু শীঘ্রই ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াই। বর্ত্তমানে কতকগুলি হিন্দী-কাগজে এই বিষয় এমন আপত্তিজনক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাতে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী বলিয়া আমার নাম উল্লেখ করিতেও এক জন লেখক ইতস্ততঃ করেন নাই। এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি অথবা লিখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আরও দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ইহার সমর্থনকারীরূপে দেখিয়াছি। তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে চাই না।

জন্ম-নিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই মত হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন যুগ হইতে আত্ম-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে এ কাজ হইয়া আসিতেছে। ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। যাহারা ইহা অভ্যাস

করেন, ইহা তাঁহাদের মঙ্গল করে। জন্ম-শাসনের কৃত্রিম উপায় আবিষ্কার না করিয়া, আত্মসংযমের উপায় বাহির করিতে পারিলে, চিকিৎসকগণ মানবজাতির কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন। সহবাসের উদ্দেশ্য সুখ নহে, ইহার উদ্দেশ্য বংশরক্ষা। সন্তান লাভের ইচ্ছা না থাকিলে যৌনমিলন অপরাধ।

কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের অর্থ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া। ইহার ফলে স্ত্রীপুরুষ সকলে উচ্ছৃঙ্খল হয়। এই উপায়কে যেরূপ সম্মানজনক মনে করা হইতেছে তার ফলে, সমাজের ভয়ে লোকে যতখানি সংযত হইয়া চলে, তাহা দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইবে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়িবে; ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধে বেশী ক্ষতি করিবে। কোনো কাজ করিয়া, তার ফল এড়াইতে যাওয়া অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ। যে অতিরিক্ত খায়, পেটের বেদনা হইলে, এবং উপবাস করিলে তাহার মঙ্গল হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া, তার ফল হইতে মুক্ত হইবার জন্য টনিক অথবা অন্য ঔষধ খাইলে ক্ষতি হয়। বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া, তার ফল এড়াইতে চাওয়া আরও খারাপ। প্রকৃতি দেবী নির্দ্দয়, তাঁহার আইন ভঙ্গ করিলে তিনি পূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। নৈতিক বাধা দ্বারা নৈতিক ফল পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে ঠেকাইতে গেলে, ঠেকানর আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনকারীরা এই যুক্তি পেশ করেন যে, একটু হাল ছাড়িয়া দিয়া চলাই জীবনের পক্ষে দরকারী। ইহা অপেক্ষা কিছুই ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না। যাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে উৎসুক, প্রাচীনকালে লোকে কিরূপে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ইহা করিতেন তাঁহারা তাহা স্থির করিয়া সেই পথ পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করুন। তাহাদের সম্মুখে অনেক প্রাথমিক

বাধাবিপত্তি আসিবে। বাল্য বিবাহের ফলেও লোক-সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িতেছে। বর্ত্তমান কালের জীবনযাপন-প্রণালীও, অবাধ বংশবৃদ্ধির জন্য অনেক খানি দায়ী। এই সব কারণ অনুসন্ধান করিয়া, প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিলে নীতি হিসাবে সমাজ উন্নত হইবে। অধৈর্য্য হইয়া লোকে যদি এসব অগ্রাহ্য করে এবং কৃত্রিম উপায় যদি প্রচলিত হইয়া উঠে, তবে ইহাতে নৈতিক অধঃপতন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

যে সমাজ নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়াছে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে, তাহা আরও শক্তিহীন হইবে। যাঁহারা চিন্তা না করিয়াই কৃত্রিম উপায় সমর্থন করেন, তাঁহারা যেন আবার এই বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনিষ্টকর প্রচার হইতে বিরত থাকেন, এবং বিবাহিত অবিবাহিত সকলের ভিতর ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করেন। ইহাই জন্ম নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১২ মার্চ্চ ১৯২৫

বিরুদ্ধ মত আলোচনা

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া কয়েক ব্যক্তি আমাকে চিঠি দিয়াছেন। সকলেই উৎসাহের সহিত কৃত্রিম উপায় সমর্থন করিয়াছেন। তার মধ্য হইতে সেরেফ তিনখানি পত্র নমুনা স্বরূপ বাছিয়া লইলাম। আর একখানি চিঠি আছে; কিন্তু প্রধানত ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বলিয়া এখানি বাদ দিলাম। এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন :—

"আমি মানি যে, 'জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই মত হইতে পারে না।' আমি ইহাও স্বীকার করি যে, যাঁহারা 'ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করেন, ইহা অমোঘ ঔষধের ন্যায় তাঁহাদের মঙ্গল করে।' কিন্তু আমি প্রশ্ন করি 'আত্ম-সংযম' অপেক্ষা 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' সমস্যা সমাধান করা কি বেশী প্রয়োজনীয় নহে? ইহা সত্য হইলে দেখিতে হইবে, আত্মসংযম দ্বারা সাধারণ লোকের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর কি না।

"আমি বিশ্বাস করি, স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তি ও সমাজের দিক দিয়া এই সমস্যার আলোচনা করা চলে। কামপ্রবৃত্তি সংযত করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফুরণ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যাঁহাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত উন্নত এবং যাঁহারা নিজেদের সামনে এই মহান আদর্শ রাখিয়া চলেন, এরূপ লোক সব সময় কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো ধারণা আছে কিনা তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। সন্ন্যাসী মুক্তির সন্ধানে বাহির হয়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধার সে ধারে না।

"কিন্তু এই উপায় কি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবে? প্রত্যেক চিন্তাশীল ও পরিণামদর্শী গৃহস্থকে এখনই এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। এক ব্যক্তি ক'টি সন্তানের খোরপোষ ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারে তাহা অবিলম্বে স্থির করা দরকার। লোকচরিত্র সম্বন্ধে আপনার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে কি আশা করিতে পারেন যে, সন্তান লাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বহু লোক ইন্দ্রিয়-সুখভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইবে? আমি মনে করি, স্মৃতিকারদের ন্যায় আপনি যুক্তিযুক্ত ও পরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার সমর্থন করেন। বেশীর ভাগ লোককে বলিতে হইবে, তাহারা যেন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা অথবা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করে—কিন্তু ইহাকে যেন নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ইহাতে কি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা হইবে? আমার মনে হয়, তখন ভাল লোক বেশী হইবে, কিন্তু লোক-সংখ্যা কমিবে না। বাস্তবিক লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা তখন আরও তীব্র হইবে, কারণ নিস্তেজ অপেক্ষা বীর্য্যবান লোকের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা শীঘ্র বাড়ে। গো-চাষের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গরুর সংখ্যা কমে নাই; ইহাতে আমরা বেশী সংখ্যায় ভাল গরু পাইয়াছি।

"আমি মানি, মিলনের উদ্দেশ্য সুখ নহে; ইহার উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন করা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, একমাত্র কারণ না হইলেও শারীরিক সুখই ইহার প্রধান প্রেরণা। নিজের কাজ হাসিল করার জন্য প্রকৃতি এই প্রলোভনের ফাঁদ পাতেন। শারীরিক সুখ না থাকিলে, কয়জনে ইহাতে লিপ্ত হইত। কতজন সুখের জন্য ইহাতে লিপ্ত হয় এবং সন্তানলাভ করে, আর কত জনই বা সন্তান

লাভের জন্য ইহা করে এবং সুখও পায়? আপনি বলেন, 'সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছা না থাকিলে, সহবাস করা পাপ।' আপনার ন্যায় সন্ন্যাসীর পক্ষে একথা বলা বেশ সাজে, কারণ আপনি কি বলেন নাই যে, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ যার আছে সে চোর সে ডাকাত; যে ব্যক্তি অন্যকে বেশী ভালবাসে না সে নিজেকেও কম ভালবাসে? কিন্তু কেন আপনি দুর্ব্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি এত কঠোর? সন্তান লাভের ইচ্ছা না থাকিলেও শরীর ও মনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সময় এক আধটু ইন্দ্রিয় সুখ তাহাদিগকে শান্তি দিয়া থাকে। সন্তান জন্মের ভয় অনেক স্থলে স্নায়ুকে উত্তেজিত করিবে এবং কোনো কোনো স্থলে বিবাহ পিছাইয়া দিবে। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে সন্তান লাভের ইচ্ছা কমিয়া যায়। এই সময় যৌন-মিলন কি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? আপনি কি মনে করেন, যে ব্যক্তি এই অপরাধ করিতে ভীত, সে শুধু তার চঞ্চল ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বার রুদ্ধ করিয়াই নৈতিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে? মোটের উপর, যাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ রাখে, সে সব চোরকে আপনি কেন বরদাস্ত করেন, আর যাহারা সন্তান লাভের ইচ্ছা পূর্ণ হইলে সম্ভোগ করে, সে সব অপরাধীকে কেন বরদাস্ত কবিতে পারেন না। 'চোরের' সংখ্যা অনেক বেশী, এবং তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া বুঝি এ ব্যবস্থা?

"আপনি বলেন, 'কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের অর্থ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া। ইহার ফলে স্ত্রী-পুরুষ সকলে উচ্ছৃঙ্খল হয়।' সত্য হইলে ইহা গুরুতর অভিযোগ। জনমত কি কখনও এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, ইহা সম্ভোগেচ্ছাকে সংযত করিতে পারিয়াছে? লোকমতের ভয়ে মদ ছাড়িয়াছে এরূপ কতকগুলি মাতালের কথা আমি জানি।

লোকে বলে, 'জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি,' 'ভগবানের ইচ্ছায় লোকে সন্তান লাভ করে, এবং অনেক সন্তান লাভ করা পৌরুষের লক্ষণ।' আমি অনেক ঘটনা জানি যেখানে এইরূপ মত পোষণের জন্য স্বামী, স্ত্রীকে শুধু ইন্দ্রিয় সেবার যন্ত্র মনে করে এবং তাহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করে—তাহারা ভাবে ইন্দ্রিয় সেবাই বিবাহের প্রধান বন্ধন। কৃত্রিম প্রথা অবলম্বন করিলে সত্যই কি শরীর ও মন দুর্ব্বল হয়? আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিকগণ এমন উপায় বাহির করিয়াছেন অথবা শীঘ্রই করিবেন, যাহা কোনো প্রকার অনিষ্ট করিবে না। ইহা মানুষের সাধ্যাতীত নহে।

"কিন্তু মনে হয় আপনি কোনো অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে বলিবেন না, কারণ আপনার মতে, 'কোনো কাজ করিয়া তার ফল এড়াইতে যাওয়া অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ।' আপনার এ-কথাটি খুব সুন্দর যে, 'সন্তানলাভের ইচ্ছা না থাকিলে পরিমিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিও নীতিবিরুদ্ধ।' কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সন্তান জন্মের ভয়ে কি কেহ কখনও আপনাকে সামলাইয়া চলিয়াছে? স্বাস্থ্য ও প্রকৃত সুখ নষ্ট হইবে জানিয়াও অনেকে 'হাতুড়ে'র পরামর্শ লয়। নিজেদের কাজের ফল এড়াইতে গিয়া কত না গর্ভপাত সংঘটিত হইয়াছে! আর ভয়ই যদি সংযমের কারণ হয়, তবে ইহার নৈতিক পরিণাম ভাল হইতে পারে না। তা ছাড়া কোন্ নিয়মে পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তান করিবে, এবং ব্যক্তির অন্যায়ের জন্য সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে? 'প্রকৃতি দেবী নির্দ্দয়, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিলে তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন।' কেন ভাবেন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করা হয়? কৃত্রিম দাঁত চোখ

প্রভৃতি ব্যবহার করাকে কেহ অস্বাভাবিক বলে না। যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় না শুধু তাহাই অস্বাভাবিক। আমার মনে হয় না যে মানুষের মন স্বভাবত পাপপ্রবণ, এবং এই সব উপায় অবলম্বনের ফলে তাহাদের আরও অধোগতি হইবে। এখনও দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছে—ভারতও বাদ যাইবে না। মানুষ বিজ্ঞান-লব্ধ এই নূতন শক্তির সদ্ব্যবহার করিবে কি অসদ্ব্যবহার করিবে, এই দুই পক্ষেই সমান যুক্তি দেখান যায়। দেখিতেছি প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করার এই বিপুল শক্তি মানুষ শীঘ্রই লাভ করিবে। ইহাকে অগ্রাহ্য করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। ইহাকে ত্যাগ না করিয়া সংযতভাবে পরিচালনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। মানবসমাজের কল্যাণকামী অনেকে ইহা প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয় সেবা নহে। নারীর কথাও ভুলিলে চলিবে না। তাহার প্রয়োজনের প্রতি অনেক দিন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে তাহার নিজের কথাও না শুনিলে হইবে না। পুরুষ তাহার দেহকে শুধু সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিবে, ইহাতে তাহার আপত্তি হইবে।

"বর্ত্তমান সভ্যতার তাল সামলাইয়া অনেক সন্তানের জননী হওয়া নারীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ ইহাতে তাহাকে অতিমাত্রায় বিব্রত হইতে হয়। ডাক্তার মেরী ষ্টোপস্ এবং মিস এলেন-কী নিশ্চয়ই নারীজাতির মানসিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন না। তাঁহাদের পরামর্শ প্রধানত নারীর দ্বারাই কার্য্যকরী করা যায়—ইহাতে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধি না করিয়া উন্নত মাতৃত্বের বিকাশ সাধন করিবে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দু' টি খারাপের ভিতর

হইতে 'মন্দের ভাল হিসাবে' কম খারাপটি বাছিয়া লইতে হইবে। মানসিক দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়াও, বিপদজনক ব্যাধি এড়াইতে হইবে। শিশুর দুগ্ধ ত্যাগের একটা সময় আছে, তাহার পূর্ব্বে মিলন অনিবার্য্য, কিন্তু তখন সন্তান জন্মিলে মায়ের অনিষ্ট হইবে। এমন নারীও আছে যাহারা স্বভাবত সুস্থ, কিন্তু গর্ভ হইলে তাহাদের জীবন বিপন্ন হয়।

"আমি এ ইচ্ছা অথবা আশাও করি না যে, আপনি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রচার করেন। সত্য ও পবিত্রতার আলোক যাঁহারা খোঁজ করিতেছেন, তাঁহাদের সামনে ইহা ধরিয়া আপনি ভাল করিতেছেন। বিমৃষ্য পিতা অথবা মাতা ইহার খোঁজ করিবে, কিন্তু অবিমৃষ্য বাপ মা এ-খোঁজ করিবে না। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলে, লোকে সহজে সংযম অভ্যাস করিবে। বর্ত্তমানে লোকের ভোগবাসনা, চিন্তা-হীনতা এবং অজ্ঞতা এত বেশী যে, আপনার চেষ্টা উলুবনে মুক্তা ছড়ানর ন্যায় ঠেকিতেছে। নিজের মত সমর্থনের জন্য অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যে আলোচনা আপনি করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বিশদভাবে ইহা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। ইহাতে আপনি যোগ দিতে না পারিলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং দরকার হইলে উপযুক্ত সময়ে ইহাকে চালনা করিতেও পারেন, কারণ বিপদ আসন্ন। ইহাকে চোখ ঠারিলে, অথবা ইহা লইয়া আলোচনা করিতে ইতস্ততঃ করিলে কোন লাভ নাই।"

প্রথমে স্পষ্টই বলিয়া রাখি, আমি সন্ন্যাসীদের জন্য অথবা সন্ন্যাসীর মতন ইহা লিখি নাই। প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী হওয়ার দাবীও আমি করি না। আজ তক আমার নিজের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমি এ সব লিখিয়াছি—ইহার ভিতর ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কিছু কিছু নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, যাহারা আমার

সহিত এই পরীক্ষায় যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথাও ইহাতে আছে—এই পরীক্ষা এতদিন ধরিয়া চলিয়াছিল যে, ইহা হইতে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি দাবী করি, এই পরীক্ষার কতক অংশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঠিক। ইহার ভিত্তি বিলকুল নৈতিক হইলেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। আমার নিজের পরীক্ষার মূল বিশেষভাবে ইহাই। পরে বিচার করার ফলে মহান নৈতিক ফল লাভ হইয়াছিল—পরন্তু ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গতি অনুসারে ঘটিয়াছিল। আমি বলিতে পারি যে, হিসাব করিয়া চলিলে, বেশী কষ্ট না করিয়াও সম্পূর্ণরূপে সংযম পালন করা যায়। আর এ দাবী শুধু আমার নহে, জার্ম্মান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণও এ দাবী করেন। তাঁহারা বলেন, জল ও মাটির প্রয়োগ, এবং অনুত্তেজক দ্রব্য বিশেষতঃ ফলাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে শীতল রাখে, পাশববৃত্তিকে সহজে সংযত করার সাহায্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে বলশালী করে। রাজযোগীরা বলেন, কেবল যথাবিধি প্রাণায়াম করিলেও এইরূপ ফল লাভ করা যায়। পাশ্চাত্যদেশের ও প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা প্রণালীর কোনোটি সন্ন্যাসীর জন্য নহে, ইহা প্রধানত গৃহীর জন্য। যদি কেহ বলেন ভারতের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ দরকার, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিব। কারণ ইহার কোনো প্রমাণ নাই। জমির উচিত বন্দোবস্ত, উন্নত ধরণের কৃষির প্রচলন এবং অবসর কালের জন্য কোনো শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে, ভারতে এখন যত লোক বাস করে, তার দ্বিগুণ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু আমি দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জন্ম-নিয়ন্ত্রণবাদীদের দলে যোগ দিয়াছি।

আমি অবশ্য বলিব, সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা পূর্ণ হইলে লোকের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করা হইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। আত্ম-সংযমের উপায়কে লোকপ্রিয় ও কার্য্যকরী করা যায়। শিক্ষিত লোকে ইহা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। একান্নবর্ত্তিতার কল্যাণে, তাঁহারা এখনও ইহার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। যাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অন্তর্গত নৈতিক প্রশ্নের কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আল্‌গা বক্তৃতা ভিন্ন, সন্তান-জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আত্ম-সংযম প্রচারের জন্য কোনো প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা করা হয় নাই। অন্যপক্ষে এ কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, পরিবারে বহুলোক থাকা মঙ্গলজনক এবং এজন্য ইহা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মোপদেশকগণ এ শিক্ষা প্রায়ই দেন না যে, অবস্থা বিশেষে সন্তানের জন্ম দেওয়া যেমন ধর্ম্ম কাজ, তেমনি কতকগুলি অবস্থায় পরিমিত সন্তানোৎপত্তি করাও ধর্ম্মকাজ।

আমার ভয় হয়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণবাদীরা ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, পাশববৃত্তির চরিতার্থতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। নারীর জন্য যে দরদ দেখান হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত করুণা-জনক। আমার মতে নারীর কথা পাড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থন করিলে নারীর অপমান করা হয়। একেতো ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য পুরুষ তাহাকে যথেষ্ট অধঃপাতিত করিয়াছে; তার উপর, জন্ম-নিয়ন্ত্রণবাদীরা যতই সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হউন না কেন, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে, তাহাকে আরও অধঃপাতিত করা হইবে। জানি, আজকাল এমন নারীও আছে, যাহারা ইহার পক্ষপাতী। কিন্তু আমার সন্দেহ নাই যে, অধিকাংশ নারী সম্মানের হানিকর বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি পুরুষ তার মঙ্গল চায়, তবে সে যেন নিজেকে

সামলাইয়া চলে। নারীতো পুরুষকে প্রলুব্ধ করে না। বাস্তবিক পুরুষই যখন জুলুম করে, তখন পুরুষই প্রলোভন-দাতা ও অপরাধী।

কৃত্রিম উপায় সমর্থনকারীদিগকে আমি ইহার ফলের কথা ভাবিতে বলি। ইহার বহুল প্রচলন হইলে, বিবাহবন্ধন ছিন্ন এবং অবাধ প্রেমের প্রসার হইবে। শুধু ভোগের জন্য মানুষ যদি ইন্দ্রিয়সেবা করিতে পারে, তবে যখন সে অনেক দিন ধরিয়া বাড়ী হইতে দূরে থাকিবে, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবে, বিপত্নীক হইবে, কিংবা তাহার স্ত্রী এত অসুস্থ হইবে যে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলেও সহবাসের ফলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে, তখন সে কি করিবে?

কিন্তু আর এক ব্যক্তি লিখিতেছেন :—

"জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা সম্পূর্ণরূপে হানিকর। যুক্তির দ্বারা প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে আপনি পূর্ব্ব হইতেই মানিয়া লইয়াছেন। ১৯২২ সালে লণ্ডনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমিতির এক বৈঠকে ১৬১৩ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যকর উপায়ে গর্ভসঞ্চার হইতে না দেওয়া নীতি ন্যায় ও শরীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গর্ভপাত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই উপায় যে অনিষ্টকর অথবা বন্ধ্যাত্ব উৎপাদক তাহার কোনো প্রমাণ নাই। এই বৈঠকে শুধু চিকিৎসকগণ যোগ দিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে অনেক নারীও ছিলেন। তাঁহাদের মত কলমের এক খোঁচায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

"আপনি বলেন, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে শরীর ও মন নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইবে। কেন "নিশ্চয় দুর্ব্বল হইবে!" আমি বলি, যোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ব্বলতা আসিবে না। হাঁ, ক্ষতিকর উপায় অবলম্বন করিলে অবশ্য দুর্ব্বলতা আসিবে। এ জন্য উপযুক্ত বয়সের

নর-নারীদের ঠিক শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই সব উপায়কে আপনি কৃত্রিম বলিয়া দোষ দেন, এবং তথাপি চিকিৎসকদিগকে সংযমের উপায় নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন। আপনার উদ্দেশ্য কি তা ঠিক বুঝিতেছি না। চিকিৎসকদ্বারা উদ্ভাবিত, কোনো উপায় কি কৃত্রিম হইবে না? আপনি বলেন, মিলনের অর্থ সন্তানোৎপাদন—শারীরিক সুখ নহে। কে ইহা বলিয়াছেন? ভগবান? যদি তাই হয়, তবে তিনি কেন ভোগবাসনা সৃষ্টি করিলেন? আপনি আরও বলেন, 'প্রকৃতি নির্দ্দয়, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিলে তিনি পূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন।' কিন্তু ভগবানকে যেরূপ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা যায়, প্রকৃতি নিশ্চয়ই সেরূপ ব্যক্তি নহেন এবং কাহারও উপর কোনো হুকুম জারি করেন না। প্রকৃতির কাজের ফল অনিবার্য্য—আমরা সেই ফলকে ভাল অথবা মন্দ বলি। যে সব লোক কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাহারা, যাহারা ইহা করে না, তাহাদের ন্যায় নিজেদের কাজের ফল ভোগ করিবে। আপনি যদি বুঝাইতে না পারেন যে, কৃত্রিম উপায় হানিকর, তবে আপনার যুক্তি কোনো কাজের নহে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঠিক উপায় অবলম্বন করিলে, কোনো ক্ষতি হয় না। কাজকে ভাল মন্দ বলিতে হইবে তার ফল দেখিয়া—তার নৈতিক ভিত্তি দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে কোনো ধারণা করিলে চলিবে না।

"আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, ম্যালথাসও লোককে সেই পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার ন্যায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক ভিন্ন ইহা কাহারও কাজে লাগিবে না। যে সব নিয়মপ্রণালী কাজে খাটান যায় না, সেগুলি সমর্থন করায় লাভ কি? ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে। যাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনো কুসংস্কার নাই এরূপ বহু ডাক্তার বলেন, ব্রহ্মচর্য্য ২২ বৎসর বা তদূর্দ্ধ

বয়সের লোকের বিশেষ অনিষ্ট করে। ধর্ম্মগত কুসংস্কারের বশে আপনি বলেন, সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন সম্ভোগ পাপ। যখন পূর্ব্ব হইতে কেহই সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না, তখন পূর্ণ সংযম পালন না করিলে, আপনার মতে লোকের সর্ব্বদাই পাপ করার সম্ভাবনা থাকিবে। শরীর-বিজ্ঞান তো একথা বলে না—এবং আজকাল লোককে বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিতে বলায় কোনো লাভ নাই।"

লেখক হয়ত প্রশ্নের সমাধান চান না। বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা যদি স্থায়ী করিতে চাই, তবে ভোগকে নহে আত্ম-সংযমকে জীবনের ধর্ম্ম রূপে ধরিতে হইবে, আমি ইহার উদাহরণ যথেষ্ট দিয়াছি। যাহা প্রমাণ করা দরকার ছিল, তাহা আমি ধরিয়া লই নাই, কারণ কৃত্রিম উপায় যতই ঠিক হউক না কেন তাহা হানিকর। এই সব উপায় নিজেরা খোদ অনিষ্টকর নহে, কিন্তু ইহারা এই হিসাবে হানিকর যে ইহার দ্বারা বিষয়-ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হয় এবং বাড়িয়াই চলে। যাহার মনের এই চিন্তা করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, বিষয়-ভোগ শুধু বিধি-বিহিত নহে কিন্তু বাঞ্ছনীয়, সে সব সময় ভোগ বাসনায় রত থাকিবে এবং অবশেষে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, তার সকল সঙ্কল্প-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি জোর দিয়া বলিতেছি যে, নরনারীর শরীর মন ও আত্মাকে সবল রাখার পক্ষে বীর্য্যরক্ষা বিশেষ দরকার; বিষয় ভোগ করিলে প্রতিবারই তাহা কমিয়া যায়। পত্র-লেখক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না মনে হওয়ায়, ইহার পূর্ব্বে আলোচনা কালে ইচ্ছা করিয়াই আমি আত্মা শব্দ ব্যবহার করি নাই, এবং সেরেফ তাহার যুক্তির উত্তর দিয়াছি। ভারতবর্ষে একেতো বিবাহিত লোকের সংখ্যা বেশী; তার উপর তাহারা

যথেষ্ট দুর্ব্বল। অন্য কোনো কারণে না হইলেও প্রনষ্ট জীবনীশক্তি পুনর্লাভের জন্য তাহাকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে, কৃত্রিম সাধনের সাহায্যে বিষয়-ভোগ শিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের সংবাদ-পত্রে কিরূপ কুৎসিৎ ঔষধের বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহা দেখিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণবাদীরা যেন হুঁসিয়ার হন। কৃত্রিম লজ্জাশীলতা বা মিথ্যা সঙ্কোচের জন্য আমি ইহার আলোচনা করা হইতে বিরত হইতেছি না। দেশের দুর্ব্বল এবং জীবনীশক্তিহীন যুবকগণ সহজে আপাতঃসুন্দর যুক্তি দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় সেবার পক্ষপাতী হইতে পারে ভাবিয়া আমি ইহার আলোচনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

দ্বিতীয় পত্রলেখক যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়াছেন, তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো এখন নাই। আমার কথার সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, উপযুক্ত উপায় শরীরযন্ত্রের কোনো অনিষ্ট করে অথবা বন্ধ্যাত্ব আনে। নামজাদা যত চিকিৎসক যাহাই বলুন না কেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি শত শত যুবক, এমন কি নিজেদের পত্নীর সহবাসেও, ইন্দ্রিয়সেবা করিতে গিয়া জীবন মাটি করিয়াছে।

প্রথম লেখক কৃত্রিম দন্তের সহিত যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা এ ক্ষেত্রে খাটে না। অস্বাভাবিক হইলেও, কৃত্রিম দাঁত দিয়া এক প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ হয়। ক্ষুধা শান্তির জন্য না খাইয়া জিহ্বার তৃপ্তির জন্য খাওয়াটা যেরূপ, বিষয় ভোগের জন্য কৃত্রিম উপায়ে বিষয় ভোগ করাও সেইরূপ। রসনা তৃপ্তির জন্য খাওয়ার ন্যায়, বিষয় ভোগের জন্য ইন্দ্রিয় সেবা করা পাপ।

শেষের চিঠিতে এক নূতন খবর আছে—

"এই প্রশ্ন লইয়া সব গভর্ণমেণ্টই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনার 'জন্ম-নিরোধ' প্রবন্ধের কথা বলিতেছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রচারের বিরুদ্ধে এবং প্রাচ্য-শক্তি জাপান খোলাখুলিভাবে ইহার সমর্থন করিয়াছে। আমেরিকা যে কেন কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক যে কোনো উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, এবং জাপান বা কেন ইহা সমর্থন করে, তাহা সকলেই ভালভাবে জানেন। আমার মতে আমেরিকার কাজের ভিতর প্রশংসার কিছু নাই। জাপানের কাজের ভিতর কি নিন্দার কিছু আছে? এ জন্য কি জাপান গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরী পাইতে পারে না? সন্তান-জন্ম তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করা দরকার; আজকাল মানুষের স্বভাব কিরূপ তার হিসাবও তাহারা রাখে। পাশ্চাত্যদেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলিতে লোকে যাহা বুঝে তাহাই কি তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় নহে? আপনি বলিবেন, 'কখনও না।' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে পথে চলিতে বলেন, লোকে কি তাহা পারিবে? ইহা আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যায়? মানুষ কি ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ হইতে বিরত হইবে? যাহারা আত্ম-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এরূপ অল্প সংখ্যক লোক সহজে মিলিতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচলনের জন্য কি কোনো আন্দোলন চলিতে পারে? ভারতের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকলকে লইয়া আন্দোলন না চালাইলে কোনো ফল হইবে না।"

আমেরিকা ও জাপানের এই সব খবর আমি রাখি না। জানি না জাপান কেন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিতেছে। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, সত্যই যদি জাপানে সকলের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে

জন্ম-নিরোধ করা প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে আমি উচ্চকণ্ঠে বলিব, এই সুন্দর জাতি দ্রুত নৈতিক অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমি সম্পূর্ণরূপে ভুল করিতে পারি। আমার সিদ্ধান্তের ভিত্তি গলদপূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন, তাঁহাদেরও ধৈর্য্য ধরা উচিত। আধুনিক উদাহরণ ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে অপর কোনো যুক্তি নাই। যাহা মানবজাতির নীতি জ্ঞানকে এমন প্রচণ্ডভাবে আহত করে, সে সম্বন্ধে এত তাড়াতাড়ি একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। যৌবনের সহিত খেলা করা সহজ, কিন্তু ইহার খারাপ ফল শোধরান শক্ত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—এপ্রিল ২, ১৯২৫

মনোবৃত্তির প্রভাব

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন :—

"সন্তান-নিগ্রহ সম্বন্ধে 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। আপনি হয়ত জে-এ-হ্যাড্‌ফিল্ডের 'মনোবিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্ম' নামক বই দেখিয়াছেন। তাহা হইতে উদ্ধৃত নীচের লেখার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :—

"বিষয়-ভোগকে তখনই স্বেচ্ছাচার বলিতে হইবে, যখন ইহা নীতির বিরোধী; ইহাকে তখনই নির্দ্দোষ আনন্দ বলিতে হইবে, যখন ইহা প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ। বিষয়-বাসনাকে এই প্রকারে প্রকাশ হইতে দিলে দাম্পত্যপ্রেম গভীর হয়, ইহা নষ্ট হয় না।" ভুলক্রমে তুচ্ছ সুখ মনে করিয়া ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিলে অশান্তি বাড়ে এবং ভালবাসা কমে।" অর্থাৎ তিনি বলেন, সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্য না থাকিলেও, সহবাসের ফলে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার এই কথা সত্য হইলে, আপনি কিরূপে আপনার মত ঠিক বলিয়া প্রমাণ করিবেন যে, সন্তানোৎপাদন করার ইচ্ছা হইলেই সহবাস করা উচিত, অন্যথা নহে। আমার মনে হয়, ঐ গ্রন্থকারের কথাই ঠিক, কারণ তিনি একজন বড় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তা ছাড়া আমি এমন ঘটনার কথা জানি, যেখানে ভালবাসাকে কাজে প্রকাশ করার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে বাধা দেওয়ার ফলে দাম্পত্য জীবন নীরস অথবা নষ্ট হইয়াছে।

"ধরা যাউক, কোনো যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবাসে। ইহা সুন্দর এবং ভগবানের ইচ্ছায় এরূপ হয়। কিন্তু সন্তানের ভরণপোষণ করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী টাকাপয়সা তাহাদের নাই। আমার মনে হয়, আপনি বলিবেন, মানুষ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে, সন্তানের জন্ম দেওয়া তাহাদের পক্ষে পাপ। ইহাও হইতে পারে—সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হইবে, অথবা তাহার অনেক সন্তান জন্মিয়াছে। আপনার কথামত তাহাদের দু'টি রাস্তা আছে—হয় তাহারা বিবাহ করিবে এবং পৃথক থাকিবে, না হয় তাহারা অবিবাহিত থাকিবে। প্রথম পথে চলিলে, হ্যাডফিল্ডের কথা অনুসারে কামনা তৃপ্তির অভাবে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের ভালবাসা নষ্ট হইয়া যাইবে। শেষোক্ত পথে চলিলেও তাহাদের ভালবাসা নষ্ট হইবে, কারণ প্রকৃতি মানুষের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে। তাহারা অবশ্য পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারে, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মন চুপ করিয়া থাকিবে না, বরং সমস্যা আরও জটিল হইতে পারে। সমাজ যদি এরূপে পরিবর্তিত হয় যে, প্রত্যেকে ইচ্ছামত সন্তান জন্ম দিতে পারে, তাহা হইলেও অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমাজের এবং অতিরিক্ত সন্তান প্রসবহেতু স্ত্রীর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ মানুষ খুব বেশী করিয়া নিজেকে সামলাইয়া চলিলেও, বৎসরে একটি সন্তান জন্ম দিতে পারে। আপনি হয় ব্রহ্মচর্য্য না হয় সন্তান নিগ্রহ সমর্থন করিবেন; কারণ সাময়িক ইন্দ্রিয়-সেবার ফলে প্রতিবৎসর সন্তান হওয়াতে অনেক মাতার মৃত্যু হইয়াছে; এই ব্যাপার ইংরেজ পাদ্রীদের ভিতরেও ঘটিয়াছে—অবশ্য পাদ্রীরা এরূপ স্থলে বলেন, ভগবান তাঁহার স্ত্রীকে এই সন্তান দান করিয়াছেন।

"গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ করার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতির

কাজে যতখানি হস্তক্ষেপ করা হয়, আপনি যাহাকে আত্ম-সংযম বলেন, তাহা অভ্যাস করিতে গেলে কি প্রকৃতির কাজে তাহা অপেক্ষা বেশী হস্তক্ষেপ করা হইবে না? কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে লোকে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের পাপের ফলে কোনো সন্তান হইবে না বলিয়া শুধু তাহারাই দুঃখ ভোগ করিবে, অপর কেহ দুঃখভোগ করিবে না। যাহারা কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লয় না, তাহারাও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার দোষ হইতে মুক্ত হইবে না, এবং তাহাদের পাপে শুধু তাহারা নহে তাহাদের সন্তান-সন্ততিও ভুগিবে। ইংলণ্ডে আজকাল খনির মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর যে বিবাদ চলিতেছে, তাহাতে পরিণামে মালিকগণই জিতিবে, কারণ শ্রমিকগণ সংখ্যায় অনেক বেশী। যাহারা অতিরিক্ত সন্তানের জন্ম দেয়, তাহারা শুধু হতভাগ্য শিশুদিগকে শাস্তি দেয় না, তাহারা মানব জাতিকে বিপন্ন করে।”

এই পত্রে মনোবৃত্তি এবং তার প্রভাবের খাসা পরিচয় পাওয়া যায়। দড়িকে যখন কেহ সাপ ভাবে, তখন সে ভয়ে মলিন হয় এবং হয় পলাইয়া যায়, না হয় কল্পিত সাপকে মারার জন্য লাঠি উঠায়। কেহ বা ভগ্নীকে স্ত্রী মনে করে, এবং তাহার মনে পাশববৃত্তি উৎপন্ন হয়; নিজের ভুল ধরিতে পারিলেই, তাহার মানসিক বিকার দূর হয়। পত্রলেখক যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও এইরূপ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইন্দ্রিয় সেবাকে তুচ্ছ সুখ মনে করিয়া, সংযম অভ্যাস করিতে গেলে অশান্তি বাড়িবে ও ভালবাসা কমিবে। কিন্তু ভালবাসার বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য এবং আরও মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চয় করার জন্য সংযম অভ্যাস করিলে, অশান্তির পরিবর্তে শান্তি বাড়িবে এবং প্রেম-বন্ধন শিথিল না হইয়া আরও মজবুত হইবে। পাশববৃত্তি

চরিতার্থ করার উপর যে ভালবাসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা একরূপ স্বার্থপরতা এবং সামান্য কারণেই ইহা নষ্ট হইতে পারে। পশুপক্ষীর মিলনকে যখন আধ্যাত্মিক স্বরূপ দেওয়া হয় না, মানুষের মিলনকে কেন আধ্যাত্মিক স্বরূপ দেওয়া হইবে? আসলে ইহা যেরূপ ইহাকে সেই ভাবে দেখি না কেন? সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য ইহার প্রতি আমরা অসহায়ভাবে আকৃষ্ট হই। খানিকটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া, যে মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধন করিবার জন্য শুধু সে ইন্দ্রিয়-সেবা না করিয়া থাকিতে পারে। অপর কোনো প্রাণী ইহা পারে না। সংস্কারবশে আমরা ভাবি, সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্য না থাকিলেও সহবাস করা দরকার এবং ইহা দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধি করে। বহুলোকের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সহবাস ভালবাসাকে শুদ্ধ করে না, বৃদ্ধি করে না অথবা স্থায়ী করে না। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ফলে প্রেম বাড়িয়াছে। অবশ্য এই সংযম পরস্পরের নৈতিক উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় বরণ করা চাই।

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হিসাবে মানবসমাজ ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যদি এইরূপে উন্নতি করে, তবে তার ভিত্তি স্থাপিত হইবে দেহের ক্ষুধার ক্রমবর্দ্ধমান সংযমের উপর। বিবাহ একটি ধর্ম্মানুশাসন, ইহা দম্পতিকে নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে চলিতে বলে, এবং মাত্র তখন ইন্দ্রিয়-সেবা সমর্থন করে, যখন সন্তান লাভের জন্য দু'জনেই ইহা ইচ্ছা করিবে। পত্রলেখক যার উল্লেখ করিয়াছেন তার উভয় স্থলেই, সন্তান জন্মের ইচ্ছা না থাকিলে ইন্দ্রিয়-সেবার কোনো প্রশ্ন উঠে না।

'সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন সহবাসের প্রয়োজন আছে'

এরূপ যুক্তি লইয়া তর্ক আরম্ভ করিলে তর্কের শেষ হইবে না। পৃথিবীর নানাদেশের শ্রেষ্ঠ মানবগণ পূর্ণ সংযম পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বলা চলে যে, পত্রলেখকের যুক্তির ভিতর গলদ আছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইহা পালন করা শক্ত হইলেও, ইহা বলা সাজে না যে, সংযম অসম্ভব অথবা ইহা বাঞ্ছিত নহে। শতবৎসর পূর্ব্বে যাহা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাহা এখন সম্ভব হইয়াছে। আর অসীম উন্নতি করার পক্ষে একশত বৎসর, কালচক্রের কত সামান্য ভগ্নাংশ? বৈজ্ঞানিকগণের কথা ঠিক হইলে, কালই তো আমরা মানবদেহ পাইয়াছি। এই দেহের সীমা কে জানে আর কে বা নির্দ্দেশ করিতে পারে? বাস্তবিক আমরা দিন দিন বুঝিতেছি যে, এই শরীরের ভালমন্দ কাজ করার অসীম ক্ষমতা আছে।

যদি স্বীকার করা যায় যে, সংযম সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়, তবে ইহা পালনের পথ জানার জন্য অবশ্য চেষ্টা করা দরকার। পূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি, সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে চলিতে হইলে, জীবন যাপন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। 'হাতে দই পাতে দই' গোছে চলিলে হইবে না। জননেন্দ্রিয়কে দমন করিতে হইলে, অপর ইন্দ্রিয়কেও দমন করিতে হইবে। যদি চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতির লাগাম ঢিলা করিয়া দেওয়া হয়, তবে জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা অসম্ভব। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অসংযমের ফলে অধিকাংশ ক্রোধশীলতা হিষ্টিরিয়া এমন কি উন্মত্ততা পর্য্যন্ত দেখা দেয়—অবশ্য ভুলক্রমে বলা হয় এগুলি সংযম পালনের চেষ্টার ফল। কোনো পাপ করিলে, অথবা কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে, শাস্তি না হইয়া যায় না।

শব্দ লইয়া আমি ঝগড়া করিতে চাই না। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধের চেষ্টা করিলে, প্রকৃতির কাজে যেরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়,

আত্ম-সংযমের সাহায্যে জন্ম-নিরোধের চেষ্টা করিলেও যদি সেইরূপ হয়, তবে তাহাই হউক। তথাপি আমি বলিব, সংযমের সাহায্যে জন্ম-নিরোধ করা উচিত ও হিতকর, কারণ ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি হয়, অপর পক্ষে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজের অধঃপতন হয় বলিয়া ইহা অন্যায়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য আত্ম-সংযমই একমাত্র ধ্রুব পথ। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পরিণাম জাতির আত্ম-হত্যা।

খনির মালিকদের পক্ষে ন্যায় না থাকা সত্ত্বে, যদি তাহারা বিজয়ী হয়, তবে মজুরদের সন্তান সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া ইহা হইবে না, মজুরগণ ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করে নাই বলিয়া ইহা সম্ভব হইবে। সন্তান না জন্মিলে উন্নতির জন্য কোনো আগ্রহ তাহাদের হইত না, এবং সে অবস্থায় তাহাদের বেতন বৃদ্ধির কোনো কারণ থাকিত না। তাহাদের কি মদ খাওয়া, সিগারেট খাওয়া এবং জুয়াখেলার কোনো প্রয়োজন আছে? খনির মালিকগণ এ সব দোষে লিপ্ত অথচ তাহারা প্রভুত্ব করে এ কথা বলিলেই কি যথেষ্ট হইবে? ধনিকদের অপেক্ষা শ্রমিকগণ যদি ভাল না হয়, তবে জগতের সহানুভূতি পাইবার কি-দাবী তাহারা করিতে পারে? এজন্য কি ধনিকদের সংখ্যা এবং মূলধন বাড়াইতে হইবে? গণবাদের দোহাই দিয়া বলা চলে, যখন ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, তখন আমাদের অবস্থা ভাল হইবে। ধন ও ধনিকের যে দোষ আমরা দিয়া থাকি, সেই সব দোষ আমরা যেন বিরাট ভাবে না করি। দুঃখের সহিত বলিতেছি, সহজে আত্ম-সংযম অভ্যাস হয় না। কিন্তু ইহার ধীর গতি যেন আমাদিগকে বিচলিত না করে। ব্যস্ত হইলে কোনো কাজ হয় না। অধৈর্য্য হইলেই জনসাধারণ বা মজুরদের অত্যধিক সন্তানোৎপত্তি বন্ধ হইবে না।

মজুরদের যাঁহারা সেবা করেন,তাঁহাদের সম্মুখে খুব মস্ত কাজ পড়িয়াছে ; মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ নিজেদের বহুমূল্য অভিজ্ঞতা হইতে সংযম সম্বন্ধে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশ তাঁহারা যেন উড়াইয়া না দেন। আজকালকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ল্যাবরেটরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গবেষণাগারে তাঁহারা তাঁহাদের মৌলিক সত্য পরীক্ষা করিয়া আমাদের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, সংযম অতি প্রয়োজনীয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯২৬

বিবাহপ্রথা উচ্ছেদ কর

আমার এক পরিচিত ব্যক্তি, শুধু তর্কের খাতিরে কতকগুলি যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন ; আমি জানি এই মত তাঁহার নিজের নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের আজকালকার নীতিধর্ম্ম কি অস্বাভাবিক নহে ? ইহা যদি স্বাভাবিক হইত, তবে সব যুগে সব স্থানে ইহা একই প্রকার হইত ; কিন্তু প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়ের বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে এবং এই সব নিয়ম চালাইতে গিয়া মানুষ আপনাকে পশু অপেক্ষা অধম করিয়াছে। কারণ জীবজন্তুর ভিতর যে সব ব্যাধি নাই, তাহা মানুষের ভিতর খুব আছে। শিশুহত্যা, গর্ভপাত, বাল্যবিবাহ পশুজগতে নাই, কিন্তু যাহারা বিবাহকে পবিত্র কার্য্য বলে, এই সব জিনিষ তাহাদের অভিশাপ-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে এবং যাহাকে আমরা নীতিধর্ম্ম বলি তাহা এত কুফল প্রসব করিয়াছে যে তার অন্ত নাই। হিন্দু-বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার জন্য বিবাহ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথা ভিন্ন আর কিসে দায়ী ? মানুষের তৈরী নিয়ম ছাড়িয়া, জীবের স্বভাবধর্ম্ম অনুসরণ করিলে কি চলে না ?"

যে যুক্তির মর্ম্ম উপরে দেওয়া হইল, পাশ্চাত্য দেশের অবাধ প্রেমের পক্ষপাতীরা এরূপ যুক্তির আশ্রয় লন অথবা ইহা অপেক্ষা বলবৎ কারণ উপস্থিত করেন তাহা জানি না ; কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি বিবাহবন্ধনকে যে বর্ব্বরতার চিহ্ন মনে করা হইতেছে তাহা স্পষ্ট পশ্চিমের আমদানী। পশ্চিম হইতে ধার করা হইলে, ইহার উত্তর দেওয়া কিছু মুস্কিল নহে।

পশুর সহিত মানুষের তুলনা করা ভুল এবং এই তুলনাই গোটা যুক্তিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। কারণ নীতিবিষয়ক সহজাত সংস্কার আছে বলিয়া মানুষ পশু অপেক্ষা উন্নত। একজনের প্রকৃতি অন্যের

প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। মানুষের ভালমন্দ বিচারশক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু পশুর এরূপ কিছুই নাই। পশুরা স্বাধীনভাবে কিছু করে না এবং ভালমন্দ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য জানে না। কাজ করার স্বাধীনতা মানুষের আছে, সে এ-সব পার্থক্য জানে এবং যখন সে তার উচ্চতর বৃত্তির অনুসরণ করে, তখন তাহাকে পশুর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ দেখা যায়, কিন্তু যখন সে তার হীনবৃত্তির অনুসরণ করে, তখন সে পশুর অধম হইতে পারে। পৃথিবীতে যে-সব জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য বলা হয়, তাহারাও যৌনমিলন সম্বন্ধে কিছু সীমা মানিয়া লয়। যদি কেহ বলেন, এই সীমানির্দ্দেশই বর্ব্বরতার চিহ্ন, তবে সমস্ত বাধা হইতে মুক্ত হওয়াই হইবে মনুষ্য-সমাজের নীতি। যদি সকল লোকে এই নীতিহীন নীতি অনুসারে চলিতে আরম্ভ করে, তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে পূর্ণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিবে। মানুষ পশু অপেক্ষা ইন্দ্রিয়পরায়ণ; যে মুহূর্ত্তে সব বাধা সরান হইবে, তখনই অসংযত ইন্দ্রিয়ের অনল উদ্গার জগৎ ছাইয়া ফেলিবে এবং মানবসমাজকে ধ্বংস করিবে। মানুষ এই হিসাবে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে, তাহার আত্ম-সংযম ও ত্যাগ আছে, কিন্তু পশুর এ সব নাই।

বিবাহ-নীতি ভঙ্গ করার জন্য আজকাল কতকগুলি ব্যাধি অত্যধিক প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। পত্র-লেখক যে সব ব্যাধির উল্লেখ করিয়াছেন, আমি জানিতে চাই, যিনি কঠোরভাবে বিবাহ-বন্ধনকে মানেন, সেরূপ একজন লোকও ঐ সব ব্যাধিতে ভুগিয়াছেন কি না। শিশুহত্যা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি ব্যাপার বিবাহনীতি ভঙ্গের ফল। নরনারী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, সুস্থ থাকিবে, সংযম পালন করিতে সক্ষম হইবে এবং সন্তান কামনা করিবে মাত্র তখন তাহারা বিবাহ করিবে—ইহাই বিবাহের নীতি। যাহারা দৃঢ়তার সহিত এই

নীতি মানে, এবং বিবাহ বন্ধনকে পবিত্র মনে করে, তাহাদের অসুখী বা দুঃখিত হইবার কোনো কারণ ঘটে না। যেখানে বিবাহ পবিত্র সেখানকার মিলন দেহের নহে, সেখানকার মিলন আত্মার মিলন—মৃত্যুও এই অচ্ছেদ্য মিলনকে নষ্ট করিতে পারে না। যেখানে আত্মার প্রকৃত মিলন হয়, সেখানে বিধবা অথবা বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহের কথা চিন্তা করা যায় না—এরূপ বিবাহ অন্যায়। যে বিবাহে বিবাহের নিয়ম মানা হয় না, সে বিবাহ বিবাহই নহে। আজকাল আমাদের মধ্যে খুব কম খাঁটি বিবাহ হয়; এজন্য বিবাহ প্রথার দোষ নাই, আমরা যে ভাবে ইহা সম্পন্ন করি তাহাই এজন্য দায়ী। এই প্রণালীর সংস্কার দরকার।

পত্রলেখক বলিতেছেন, বিবাহের ভিতর কোনো নৈতিক অথবা ধর্ম্মবন্ধন নাই—ইহা একটি প্রথা মাত্র এবং ধর্ম্ম ও নীতিবিরোধী বলিয়া ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। আমি স্বীকার করি যে, বিবাহ একটি বেষ্টনীস্বরূপ এবং ইহা ধর্ম্মকে রক্ষা করে। যদি এই বেষ্টনী ধ্বংস করা হয়, তবে ধর্ম্মও চুরমার হইয়া যাইবে। সংযমই ধর্ম্মের ভিত্তি এবং বিবাহ সংযম ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি মানি, নাস্তিক অথবা জড়বাদীকে সংযমের প্রয়োজনীয়তা বুঝান শক্ত হইতে পারে। যাহার সংযম নাই, তাহার আত্মানুভূতি লাভের আশা নাই। আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও দেহের ধ্বংসশীলতার জ্ঞান যাহার আছে, সহজাত সংস্কাররূপে তিনি জানেন, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আত্মসংযম ভিন্ন আত্মানুভূতি লাভ অসম্ভব। শরীরকে কামের বিলাসভূমি অথবা আত্মানুভূতির মন্দিরে পরিণত করা যায়। শেষোক্তক্ষেত্রে কামুকতার কোনো স্থান নাই। ইন্দ্রিয়লালসাকে আত্মিকশক্তির সাহায্যে সব সময় সংযত করিয়া রাখা চাই।

যেখানে বিবাহের বন্ধন শিথিল, যেখানে সংযমের নিয়ম পালিত হয় না, নারী সেখানকার বিবাদের কারণ হইবে। মানুষ যদি পশুর ন্যায় বন্ধনহীন হয়, তবে তাহারা সোজা ধ্বংসের পথে চলিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পত্রপ্রেরক যে সব অনিষ্টের কথা বলিয়াছেন, বিবাহপ্রথা বন্ধ করিলে সে-সব দূর হইবে না, কিন্তু বিবাহের নিয়ম কি তাহা জানিলে এবং পালন করিলেই দূর হইবে।

জানি, যেমন কতকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ চলে, অপর কতকগুলির মধ্যে ইহা নিষিদ্ধ; কোনো কোনো সম্প্রদায় বহুবিবাহ নিষেধ করে, আবার কয়েকটি সম্প্রদায় ইহার পক্ষে। একই রকম নৈতিক আদর্শ সকল সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে বেশ হইত, কিন্তু বৈচিত্র্য আছে বলিয়া ইহা বলা চলে না যে, সব বন্ধন উঠাইয়া দেওয়া দরকার। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত বিজ্ঞতা যতই বাড়িবে, আমাদের নীতিধর্ম্ম ততই একই প্রকার হইবে। আজকাল এক বিবাহকেই পৃথিবীর সব দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ মনে করা হয় এবং কোনো ধর্ম্মই লোককে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য করে না। দেশ-কাল অনুসারে কাজের বেলায় এক-আধটু শিথিলতা থাকিলেও এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতের পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমি বালবিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ শুধু ভাল ও বাঞ্ছনীয় মনে করি না, আমি বলি এরূপ বিধবা-কন্যার বিবাহ দেওয়া বাপ-মার অবশ্যকর্ত্তব্য।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—জুন ৩, ১৯২৬

ধর্ম্ম-সঙ্কট

"আমি বিবাহিত। আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। আমার স্ত্রীর বয়সও প্রায় এইরূপ। আমাদের পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল, সৌভাগ্য-বশে তার দু'টি মারা গিয়াছে। অবশিষ্ট সন্তানদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি তা আমি জানি। এই কর্ত্তব্য পালন করা অসম্ভব না হইলেও আমার পক্ষে মুস্কিল দেখিতেছি। আপনি সংযম শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে ইহা আমি পালন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার সহধর্ম্মিণী ইহার বিরুদ্ধে। সাধারণে যাহাকে জীবনের আনন্দ বলে, সে তো তাই চায়। আপনি উচ্চ স্তরে বসিয়া ইহাকে পাপ বলিতে পারেন। কিন্তু সে তো আপনার দৃষ্টিতে ইহা দেখিবে না। আরও অধিক সন্তান গর্ভে ধারণ করিতেও সে ভীত নহে। যে দায়িত্বজ্ঞান আমার আছে মনে করি, সে দায়িত্বজ্ঞান তাহার নাই। আমার পিতামাতা আমার অপেক্ষা স্ত্রীর পক্ষ বেশী অবলম্বন করেন, এবং রোজই ঝগড়া হয়। কামনা পূর্ণ না হওয়াতে সে এত খিটখিটে ও কোপন-স্বভাবা হইয়াছে যে, সামান্য কারণে সে চটিয়া উঠে। বর্ত্তমানে ইহাই আমার পক্ষে এক বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তানের সংখ্যা আমার পক্ষে অত্যধিক। তাহাদিগকে প্রতিপালন করার শক্তি আমার নাই। স্ত্রীকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছি না। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে সে কুপথগামী হইতে পারে, পাগল হইতে পারে অথবা আত্মহত্যা করিতে পারে। আমার ইচ্ছা হয়, যে-ভাবে বে-ওয়ারিশ কুকুরকে গুলি করিয়া হত্যা

করা হয় দেশের আইনে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে, যে-সব সন্তান আমি চাই না, তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিতাম। গত তিন মাস হইতে এক বেলার বেশী আমি খাই নাই—জলখাবারও জোটে নাই। আমাকে একটা কারবার দেখিতে হয়, সেজন্য একটানা লম্বা উপবাস করিতে পারি না। স্ত্রীর নিকট কোনো সহানুভূতি পাই না, কারণ সে আমাকে চালবাজ মনে করে। সন্তান নিগ্রহ সম্বন্ধে পুস্তক আমি পড়িয়াছি। সেই লেখা প্রলোভনপূর্ণ। আত্মসংযম সম্বন্ধে আপনার পুস্তকও পাঠ করিয়াছি। মহা মুস্কিলে পড়িয়াছি।"

উপরের হৃদয়বিদারক চিঠিখানি কোনো যুবক আমার নিকট লিখিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কয়েক বৎসর হইতে জানি। তিনি লিখিয়াছেন, নাম দিতে ভীত হইয়া পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট দু'খানি বেনামী চিঠি দেন—তাঁহার আশা ছিল আমি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তার আলোচনা করিব। এই ধরণের এত বেনামী চিঠি আমি পাই যে, সেগুলি লইয়া আলোচনা করিতে ইতস্ততঃ করি। এই পত্রের চর্চ্চা করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছি, যদিও জানি ইহা সাচ্চা এবং এমন এক ব্যক্তি ইহা লিখিয়াছেন যিনি আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট। বিষয়টি এমন যে খুব সাবধানে ইহার আলোচনা করা দরকার। আমি বলিয়া থাকি যে, আমার এরূপ কথা যথেষ্ট জানা আছে; বিশেষত এরূপ অবস্থায় আমার পরামর্শ অনেকের অসুবিধা দূর করিয়াছে বলিয়া আমি এই স্পষ্ট কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিতে পারি না।

ভারতের ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের অবস্থা দ্বিগুণ মুস্কিল। শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার পার্থক্য এত বেশী যে, তাহা দূর করা অসম্ভব। কোনো কোনো যুবক হয়ত মনে করে, স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল; যদিও তাহারা জানে, তালাকপ্রথা

প্রচলিত না থাকায় দরুণ তাহাদের স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারিবে না। অপর সকলে স্ত্রীকে শুধু মজা লুটিবার বস্তুতে পরিণত করে এবং তাহাকে উন্নত চিন্তার অংশ দেয় না—ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। যাঁহাদের বিবেক জাগ্রত হইয়াছে এরূপ লোক খুব অল্প আছে কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। পত্র লেখকের সামনে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের সামনেও সেই সমস্যা উপস্থিত। আমার মতে ইন্দ্রিয়সেবা তখনই বৈধ ও বাঞ্ছনীয় যখন উভয় পক্ষই ইহা ইচ্ছা করে। আমি এ অধিকার মানি না যে, একে অপরকে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধ্য করিতে পারে। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম তাহা ঠিক হইলে, স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা স্বামীর নাই। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিলে স্বামীর উপর আরও অধিক এবং মহান্ দায়িত্ব পড়িবে। তিনি পত্নীকে অবজ্ঞার চোখে দেখিবেন না, কিন্তু নম্রতার সহিত স্বীকার করিবেন যে, যাহা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, তাহা তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে পরম আবশ্যকীয়। এজন্য তিনি স্ত্রীর সহিত বিশেষ নম্র এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিবেন, এবং নিজের পবিত্রতা সম্বন্ধে এতখানি বিশ্বাস তাঁহার থাকিবে যে, তিনি পত্নীর বাসনাকে উচ্চ স্তরের শক্তিতে পরিণত করিতে পারিবেন। এজন্য তাঁহাকে পত্নীর সাচ্চা মিত্র, চালক এবং চিকিৎসক হইতে হইবে। পত্নীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং অটুট ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার এই কাজের নৈতিক ভিত্তির কথা বুঝাইতে হইবে; বিবাহের প্রকৃত অর্থ কি এবং স্বামী স্ত্রীর ভিতরে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত তাহাও স্ত্রীকে বুঝাইতে হইবে। তিনি এই কাজ করিতে করিতে দেখিবেন, যাহা প্রথমে তাহার নিকট স্পষ্ট ছিল না, এরূপ বহু জিনিষ এখন স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; এবং

নিজের সংযম সাচ্চা হইলে পত্নীকে নিজের পথে টানিতে সক্ষম হইবেন।

এই সম্পর্কে আমি ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, কেবল অধিক সন্তান লাভের ইচ্ছা না থাকাই পত্নীর সন্তোষ বিধান না করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নহে। শুধু সন্তান প্রতিপালনের ভয়ে স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ না করা আমার মতে কাপুরুষতা। বে-হিসাবী সন্তানোৎপাদন বন্ধ করার জন্য উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে বা একযোগে কাম-বাসনাকে সংযত করিতে পারেন, কিন্তু এই কারণে দম্পতির একে অপরকে একত্র শয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না।

সন্তানের জন্য ঘাবড়াইবার কারণ কি? নিশ্চয়ই সৎ, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান লোকে এত অর্থ উপায় করিতে পারে, যাহাতে সে উপযুক্ত সংখ্যক সন্তান প্রতিপালন করিতে সক্ষম। স্বীকার করি, পত্র লেখকের ন্যায় যিনি সব সময় দেশের কাজ করার জন্য সাচ্চা চেষ্টা করিতেছেন, তার পক্ষে বড় এবং বর্দ্ধমান পরিবার প্রতিপালন করা এবং একই সময়ে যে দেশের কোটি কোটি সন্তান অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে তার সেবা করা মুস্কিল। আমি অনেক সময় এই কাগজে লিখিয়াছি, যতদিন ভারত দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবে, ততদিন এখানে সন্তানের জন্ম দেওয়া অন্যায়। কিন্তু ইহা যুবক যুবতীর বিবাহ না করিয়া থাকার পক্ষে উপযুক্ত কারণ হইলেও বিবাহ করার পর সহবাস করিতে অস্বীকার করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি নহে। যখন শুদ্ধ ধর্ম্মের প্রেরণায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, তখন সহবাস না করা উচিত। যখন এই ইচ্ছা বাস্তবিক হইবে, তখন ইহার প্রভাব অপরের উপরও পড়িবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, উপযুক্ত সময়েও এইরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল না, তথাপি সঙ্গীর মৃত্যু বা পাগল হওয়ার সম্ভাবনা

থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত। সত্য রক্ষা ও দেশোদ্ধারের জন্য যেরূপ মহান ত্যাগের দরকার, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য তাহা অপেক্ষা কম ত্যাগের দরকার নাই। আমি উপরে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তার দিকে দৃষ্টি রাখিলে, ইহা বলা দরকার হইবে না যে, কৃত্রিম উপায়ে সন্তান-নিগ্রহ করা নীতিবিরুদ্ধ এবং আমার আলোচনার মূলে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহাতে ইহার কোনো স্থান নাই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—এপ্রিল ২৬, ১৯২৮

বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত

উইলিয়াম আর থার্ষ্টন আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সৈনিক বিভাগে মেজর ছিলেন। তিনি দশ বৎসর সৈন্যদলে কাজ করেন এবং এই সময় পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। চীনদেশের অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল। ভ্রমণকালে তিনি বিবাহবিষয়ক আইন এবং রীতি-নীতির পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বিবাহ বিজ্ঞান' নামে একখানি বই লেখেন। গত বৎসর নিউ ইয়র্কের টিফানি প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। বইখানিতে মাত্র বত্রিশটি পৃষ্ঠা আছে; বড় হরফে ছাপা এবং আধ ঘণ্টায় পড়িয়া শেষ করা যায়। গ্রন্থকার বিশদভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে যান নাই, কিন্তু এমন সংক্ষেপে অথচ জোরের সহিত তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি পেশ করিয়াছেন যে, প্রকাশক সেগুলিকে যথাযথভাবে বিস্ময়কর কহিয়াছেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ, চিকিৎসকদের নিকট প্রাপ্ত ঘটনাবলী, স্বাস্থ্য-বিবরণী এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি। সেই সিদ্ধান্তগুলি এই :

"১। প্রকৃতির কখনও এ অভিপ্রায় নয় যে, খোরপোষ ও আশ্রয়ের জন্য এবং সন্তান গর্ভে ধারণ করা রূপ নারী-জীবনের স্বাভাবিক অধিকার লাভ করিবার জন্য নারী চিরজীবনের নিমিত্ত পুরুষের নিকট বাঁধা থাকিবে এবং রাতের পর রাত—গর্ভাবস্থায় অথবা অন্য অবস্থায়—তাহার সহিত একই বিছানায় অথবা একই ঘরে শুইতে বাধ্য থাকিবে।

"২। প্রচলিত বিবাহ আইন ও রীতিনীতির ফলে স্ত্রীপুরুষ প্রতিদিন প্রতিরাত্রে পাশাপাশি শুইয়া থাকে—এইরূপ ব্যবস্থা অবারিত ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির পথ খোলাসা করে, স্ত্রীপুরুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিপথে চালিত করে এবং বিবাহিত নারীদের শতকরা নব্বইজনকেই বেশ্যার অনুরূপ জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে। ইহার কারণ এই যে, বিবাহিত নারীদের মনে এই ধারণা জন্মান হইয়াছে যে, এইরূপে দেহ-সমর্পণ করা বেশ্যাবৃত্তি নয় ইহা স্বাভাবিক ও ইহাতে কোনো দোষ নাই কারণ ইহা আইন সঙ্গত, এবং স্বামীর ভালবাসা স্থায়ী করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।"

গ্রন্থকার তারপর অবাধ ইন্দ্রিয়সেবার ফল বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম আমি নীচে দিলাম:

"(ক) ইহা নারীর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে, তাহাকে অকালবৃদ্ধ, রুগ্ন, খিটখিটে, চঞ্চলচিত্ত ও নিরানন্দ করে; এবং সে সন্তান লালন-পালন করিতে অক্ষম হয়।"

"(খ) ইহা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশী সন্তানের জন্মের কারণ।"

"(গ) অবাধ ইন্দ্রিয়সেবার ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকের ভিতর কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাত করার অভ্যাস প্রবর্ত্তিত হয়।" **"জন্মশাসনের বা অন্য কোনো কিছুর নামে যদি গর্ভনিরোধের উপায় অধিকাংশ সাধারণ গৃহস্থের নারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সেই জাতি সাধারণত রুগ্ন, নীতিহীন, এবং হীনচরিত্র হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইবে।"**

"(ঘ) অবাধ ইন্দ্রিয়সেবার ফলে পুরুষ ভালভাবে জীবিকা অর্জ্জনের শক্তি খোয়াইয়া বসে।" **"বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে**

বিপত্নীক অপেক্ষা কুড়ি লক্ষ বেশী বিধবা আছে। ইহাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকে যুদ্ধের ফলে বিধবা হইয়াছিল।"

"(ঙ) বিবাহিত জীবনে অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়সেবার ফলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের উচ্চাকাঙ্খা নষ্ট হয়।" **"লোকে লাভজনক কাজ পায় না বলিয়া যে দুনিয়ায় দারিদ্র্য ও বড় বড় শহরে নোংরা বস্তির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে; প্রচলিত বিবাহ আইনের ফলে অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয় সেবার জন্য ইহা হইয়াছে।"**

"(চ) মানব জাতির ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হইবে যে, গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়সেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক।"

তার পর আছে চীন ও ভারতের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ। আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। পুস্তকের অর্দ্ধেকটায় এই পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। বাকী অর্দ্ধেকে প্রতিকারের উপায় বলা হইয়াছে।

প্রতিকারের মূল নীতি এই যে, স্বামী স্ত্রী সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ঘরে থাকিবে, কাজেই পৃথক বিছানায় শুইবে; এবং যখন উভয়ে, বিশেষত স্ত্রী সন্তান কামনা করিবে, তখন তাহারা মিলিত হইবে। তিনি যেভাবে বিবাহ আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতে চাই না। দুনিয়ার সর্ব্বত্র সকল বিবাহ সম্বন্ধে একটি বিষয়ের মিল আছে—তাহা স্বামী স্ত্রীর একই ঘরে ও একই বিছানায় শয়ন করা। গ্রন্থকার অতি তীব্রভাবে ইহাঁর নিন্দা করিয়াছেন—আমার মতে তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, বিবাহিত লোকে একই ঘরে ও একই বিছানায় থাকিতে বাধ্য এই ধর্ম্মানুমোদিত কুসংস্কার আমাদের

আছে বলিয়া স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আমরা অনেকখানি ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এই কুসংস্কারের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতেছি বলিয়া ইহা এমন একটি মানসিক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার পরিণাম কিরূপ সাংঘাতিক তাহা আমরা ঠিকভাবে ধারণা করিতে পারিতেছি না।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, গ্রন্থকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তান নিরোধ করার বিরোধী।

মান্দ্রাজের উৎসাহী পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুক্ত এস গণেশান ভারতে প্রচারের জন্য পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি পাইয়াছেন। যদি তিনি ইহা করেন, তবে সামান্য পয়সা খরচ করিয়া পাঠকগণ তাহা পাইবেন। তিনি উহার অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতিও পাইয়াছেন।

অন্যান্য প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যে সব পরামর্শ গ্রন্থকার দিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আমাদের কোনো কাজে লাগিবে মনে হয় না এবং সব গুলি আইন দ্বারা সমর্থিত হওয়া দরকার। কিন্তু প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী আজ হইতে সঙ্কল্প করিতে পারেন যে, মানুষ ও অপরাপর জন্তুর মিলনের যে মহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহা সাধনের জন্য ভিন্ন তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে বিরত থাকিবেন এবং রাত্রে এক ঘরে বা এক বিছানায় থাকিবেন না। পশুরা সর্ব্বদা এই নিয়ম পালন করে। মানুষের ভালমন্দ পছন্দ করিয়া লইবার শক্তি আছে বলিয়া সে শোচনীয়ভাবে ভুল পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক নারীর কৃত্রিম উপায়ে সন্তান নিরোধ করিতে অস্বীকার করা উচিত। প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীর জানা উচিত যে, মন যদি শরীরের সহিত সহযোগিতা করে তবে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হইতে বিরত থাকিলে কোনো অসুখ হয় না, বরং ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থকার মনে করেন, জগতের দুর্গতির অধিকাংশের

মূলে রহিয়াছে বিবাহ আইনের বর্ত্তমান অবস্থা। গ্রন্থকারের এই ব্যাপক ধারণা অন্যের না থাকিলেও, আমি শেষে যে দু'টি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করিয়াছি লোকে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যদি আমরা স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার সম্বন্ধ স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার দিক হইতে দেখি এবং নিজদিগকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নৈতিক মঙ্গলের ন্যাসরক্ষক মনে করি, তবে বর্ত্তমান কালের দুর্গতি অনেকখানি এড়ান যায়।

ইয়ংইণ্ডিয়া—সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯২৮

কিরূপে কাম জয় করা যায়?

কাম-বিকার জয় করিতে প্রযত্নশীল এক পাঠক লিখিয়াছেন—"আপনার 'সত্যের প্রয়োগ বা আত্মকথা'র প্রথম ভাগ পড়িয়াছি। তাহাতে বহুত অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে। আপনি কোনো কথাই গোপন করেন নাই, এজন্য আমিও কোনো কথা গোপন রাখা ঠিক মনে করিতেছি না। 'দুর্নীতির পথে' পুস্তক পড়িয়াছি। ইহা হইতেও বিষয়-বাসনা জয় করিবার বিশেষ উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কিন্তু বিষয়-বাসনা এত শক্তিশালী যে, যোগবাসিষ্ঠ, স্বামী রামতীর্থ এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়ার সময় সব কিছু অসার মনে হইতে থাকিলেও, এ সব বই পড়া ক্ষান্ত দিলে ইহা পুনরায় প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। চোখ, নাক, কাণ প্রভৃতি তো বশে রাখা যায়; কারণ চোখ বুঝিলেই কোনো জিনিষ আর চোখে পড়ে না। অপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু জননেন্দ্রিয়ের রাস্তা তো পৃথক দেখিতেছি। যখন ইহা যন্ত্রণা দিতে সুরু করে তখন যে, সব বই পড়ার মূল্য মাটি হইয়া যায়। আমি সাত্বিক আহার করি। একবার খাই, রাত্রিতে শুধু দুধ পান করি। তাহাতেও কোনো রকমে কাম দমন করিতে পারিতেছি না। কেন এমন হইতেছে বুঝিতেছি না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক যায়গায় বলিয়াছেন:—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।

॥ অধ্যায় ২, শ্লোক ৫৯ ॥

"ইহা সত্য যে নিরাহারে থাকিলে দেহধারী জীব ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, কিন্তু ইহাতে সে বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইতে মুক্তি পায় না। এই আসক্তি তো পরমাত্মার দর্শন হইলে চলিয়া যায়।'

"তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বরের দর্শন হইলে বিষয়াসক্তি চলিয়া যায়। অন্য কথায়, ঈশ্বর দর্শন না হইলে, বিষয় হইতে মুক্তি নাই। ইহা এক কঠিন সমস্যা। এখন আমি কি করিব? আমার মতন বিষয়াসক্তকে আপনি কি কোনো রাস্তা দেখাইবেন না?

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে এইরূপ কঠিন সমস্যায় পথ দেখাইবার উপযুক্ত সাধুপুরুষ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে? কারণ আজকাল তো ভাল-মন্দ সাধু চেনাও শক্ত।"

"ইহার উত্তর 'নবজীবন' পত্রে যেন দেন; ইহাতে আমি ভাল রাস্তা ধরিতে পারিব এবং প্রভুকে পাওয়ার বাধাদানকারী বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিতে সক্ষম হইব।

"অনেক দিন হইতে আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার চেষ্টায় ছিলাম। যখন আপনার 'আত্মকথা' পড়িলাম, তখন মনে হইল এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথের অসুবিধা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার ভিতর লজ্জার কোনো কারণ নাই।"

এই পাঠকের ন্যায় আরও অনেকের অবস্থা এইরূপ। কাম জয় করা কঠিন কিন্তু ইহা অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। কিন্তু ভগবানের কথা এই, যে ব্যক্তি কাম জয় করে সে সংসার জয় করে এবং ভবসাগরের পারে যায়। অর্থাৎ কাম জয় করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কিন্তু জয় করিতে যত্নশীল অনেক লোকে ইহা স্বীকার করিতে চান না যে, এইরূপ মূল্যবান জিনিষ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য্যের দরকার। আমরা

জানি বর্ণমালা শিক্ষার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা ধৈর্য্য ও ধ্যানের আবশ্যকতা আছে। ত্রৈরাশিক হিসাবে অঙ্ক কষিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, অক্ষরজ্ঞান লাভের জন্য যে-ধৈর্য্যাদির দরকার, কামজয় করিবার জন্য তার অনন্তগুণ ধৈর্য্যের দরকার।

ইহা তো ধৈর্য্যের কথা। কামজয় করার অনেক অভ্যাস সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি। সাধারণ ব্যারাম দূর করার জন্য আমরা দুনিয়া উলট-পালট করি; ডাক্তার-কবিরাজের ঘরে ঘরে ছুটি; তন্ত্র-মন্ত্র পর্য্যন্ত বাদ দিনা। কিন্তু কাম জয় করিবার সময় দু'একটি প্রণালী অভ্যাস করিয়া ক্লান্ত হই এবং উল্টা ঈশ্বর অথবা পরামর্শদাতার সহিত সর্ত্ত করি যে, এইসব জিনিষ ছাড়িব না, কিন্তু কাম-বিকার সমূলে নষ্ট হওয়া চাই। ইহার অর্থ এই, কাম-জয় করার জন্য সাচ্চা আকুলতা আমাদের নাই। এজন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমাদের এই শিথিলতা কাম জয় করার এক প্রবল বাধা। ইহা সত্য যে, নিরাহারীর বিকার দমন হয় কিন্তু আত্ম-দর্শন বিনা আসক্তি নাশ হয় না। কিন্তু ঐ শ্লোকের অর্থ ইহা নয় যে, কামজয়ের পক্ষে নিরাহারে থাকা নিষ্ফল। ইহার অর্থ এই, উপবাস করিতে গিয়া ক্লান্তি বোধ করিবে না; এইরূপ দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প থাকিলে আত্মদর্শন হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিও নাশ হইবে। এইরূপ অনশনব্রত অন্যের কথামত গ্রহণ করা চলে না, অথবা বাহিরের আড়ম্বর দেখাইবার জন্য মঞ্জুর করা যায় না। এ জন্য তো মন বাক্য ও শরীরের সহায়তা দরকার। এই সহযোগিতা পাওয়া গেলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অবশ্য মিলিবে এবং এই অনুগ্রহ পাওয়া গেলে বিকারশান্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু অনশনব্রতের পূর্ব্বে কয়েকটি সহজ উপায় আছে। ইহাদের সাহায্যে বিকার সম্পূর্ণ শান্ত না হইলেও

ইহার শক্তি অনেক কমিবে। এজন্য ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার প্রতি বৈরাগ্য আনিতে হইবে। কারণ বৈরাগ্যহীন ত্যাগ শুধু বাহিরের ত্যাগ, এ হেতু ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ভোগবিলাস কাহাকে বলে তাহা এখানে বলার দরকার নাই। যাহা দ্বারা বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাই ত্যাগ করা চাই।

এই প্রসঙ্গে খাওয়ার কথাও বিশেষ বিচার করিতে হইবে। এখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। আমার মতে যাঁহারা কামেন্দ্রিয়কে শান্ত রাখিতে চান, তাঁহারা যেন অল্প ঘি দুধ ব্যবহার করেন। বনপক্ক শস্য খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, কৃত্রিম অগ্নিপক্ক খাদ্য খাইবে না অথবা খুব কম খাইবে। ফল এবং অনেক টাটকা শাক-সব্জী না রাঁধিয়া খাওয়া চলে—তাহাই খাইবে। কিন্তু কাঁচা শাক সব্জীর পরিমাণ কম হওয়া চাই। দু'তিন তোলা টাটকা শাক-সব্জী দ্বারা শরীরের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। মিঠাই মশলা প্রভৃতি একদম ত্যাগ করা চাই। এত বলা সত্ত্বে, জানি শুধু খোরাকীর দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ ভাবে রক্ষা করা চলে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়-উত্তেজক খাদ্য খাইয়াও মানুষ যেন ব্রহ্মচর্য্য পালনের আশা না রাখে, এরূপ আশা না করাই ঠিক।

হিন্দী-নবজীবন—১৪ মার্চ্চ, ১৯২৯

ব্রহ্মচর্য্য

আমাদের তৃতীয় ব্রত ব্রহ্মচর্য্য। আসলে দেখিতে গেলে অপর সকল ব্রত সত্য-ব্রত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং সত্যেরই পরিপোষক। যে ব্যক্তি সত্যের আশ্রয় লইয়াছে এবং শুধু তাহার উপাসনা করে অপর কোনো বস্তুর আরাধনা করিলে সে তো ব্যভিচারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তবে সে কিরূপে ইন্দ্রিয় সেবা করিবে? যাহার সকল প্রবৃত্তি সত্যের দর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সে কিরূপে সন্তানোৎপত্তি অথবা গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত থাকিবে। ভোগ-বিলাস দ্বারা কেহই সত্য লাভ করিয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তও আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই।

অহিংসা পালনের কথা ধরিলেও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত তাহা পূর্ণরূপে পালন করা অসম্ভব। অহিংসার অর্থ বিশ্বজনীন প্রেম। যে-পুরুষ একটি নারীকে এবং যে-নারী একটি মাত্র পুরুষকে আপনার সব ভালবাসা দান করে তাহার নিকট অন্যকে দিবার জন্য থাকে কি? ইহার অর্থ এই, "আমরা দু'জন প্রথমে; অবশিষ্ট সকলে বাঁচুক আর মরুক তাহা আমাদের দেখা দরকার নাই।" পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং পত্নীব্রত পুরুষ স্ত্রীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত বলিয়া ইহা সুস্পষ্ট যে, এরূপ লোকের বিশ্বজনীন প্রেম থাকিতে পারে না। বিবাহিত জীবনে কেহ দুনিয়ার সকলকে নিজের আত্মীয় বানাইতে পারে না, কারণ তাহার নিকট আপনার মনে করা আত্মীয়স্বজন আছে অথবা তৈরী হইতেছে। এই সীমাবদ্ধ পরিবারের লোক-সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, বিশ্বজনীন প্রেমে তত বাধা পড়িবে। সারা দুনিয়ায় এই ব্যাপার ঘটিতেছে। সে

জন্য অহিংসা-ব্রতধারী বিবাহ করিতে পারে না, বিবাহ না করিয়া ইন্দ্রিয়সেবার কথা তো উঠিতেই পারে না।

তবে যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহাদের কি কখনও সত্য লাভ হইবে না? তাহারা কি কখন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে সক্ষম হইবে না? আমরা ইহার রাস্তা বাহির করিয়াছি। বিবাহিতগণ যেন অবিবাহিতের ন্যায় হইয়া যান। এ সম্বন্ধে আমার সুন্দর অভিজ্ঞতা আছে। যাঁহারা এই অবস্থার আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা আমাকে পুরোপুরি সমর্থন করিবেন। আমি জানি, অনেকে এই পথে চলিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একে অপরকে ভাই ভগ্নী মনে করিতে পারিলে সকল মুস্কিল হইতে তাঁহারা মুক্ত হইবেন। সকল নারীই মাতা ভগ্নী কন্যা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ একদম উন্নত হয়, বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে চলিলে স্বামীস্ত্রীর কোনো অনিষ্ট হয় না, পরন্তু তাহাদের পুঁজি এবং দুনিয়ার সেবা করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয় ও মনের বিকার নষ্ট হয়। মনের বিকার নষ্ট হইলে পবিত্র প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং একে অপরের সেবা অধিক ভালভাবে করিতে পারে ও উভয়ের ভিতর কলহের কারণ কমে। ভালবাসা যেথানে স্বার্থযুক্ত ও সীমাবদ্ধ সেখানে কলহের অনেক কারণ থাকে।

এই প্রধান বিষয় বিচার করিয়া তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে উৎপন্ন শারীরিক লাভ, বীর্য্যলাভ প্রভৃতি বহু জিনিষ গৌণ হইয়া পড়ে। ভোগবিলাসের জন্য বীর্য্য হানি করা এবং শরীর নষ্ট করা কিরূপ মূর্খতা! শারীরিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য যে বীর্য্যের প্রয়োগ করা উচিত, তাহা বিষয়-ভোগের জন্য ব্যবহার করিলে ইহার অপব্যবহার হয় এবং এজন্য অনেক রোগ উৎপন্ন হয়।

মন, বচন ও শরীর দ্বারা এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার। প্রত্যেক ব্রত সম্বন্ধে একথা খাটে। গীতায় উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি শরীরকে বশে রাখে কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করে সে মূঢ়, মিথ্যাচারী—অভিজ্ঞতা হইতে জানি ইহা সত্য। মনকে বিকারের বশ হইতে দিয়া শরীরকে দাবাইতে চেষ্টা করিলে লোকসানই হয়। মন যেখানে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত শরীর সেখানে না গিয়া থাকিতে পারে না। এখানে একটি পার্থক্যের কথা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। মনকে বিকারবশ হইতে দেওয়া এক কথা; আর অনিচ্ছায় বলপ্রয়োগে মন নিজ হইতে যদি বিকারগ্রস্ত হয় অথবা হইতে যায় সে আর এক কথা। আমরা যদি এই ইন্দ্রিয়বিকারের সহায়ক না হই, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা জিতিবই। আমরা সকল সময় অনুভব করিয়া থাকি যে, শরীরকে অধীনে রাখা যায়, কিন্তু মন অধীন থাকে না। এজন্য অবিলম্বে শরীরকে বশে রাখিয়া মনকে অধীন করিবার জন্য নিত্য প্রযত্ন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা মনের অধীন হইয়া পড়িলে, শরীর ও মনের মধ্যে বিরোধ সুরু হইবে, মিথ্যাচার আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক কুচিন্তা দাবানর জন্য যতদিন আমরা চেষ্টা করিতে থাকিব, ততদিন মন ও শরীর একসাথে চলিতেছে বলা যায়।

এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা খুব শক্ত, প্রায় অসম্ভব মনে করা হইয়াছে। তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হইয়াছে। কাম দমনকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়াছে। আমার মনে হয় এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভুল। সকল প্রকার বিষয়তৃষ্ণা নিরোধই ব্রহ্মচর্য্য। যে ব্যক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দিয়া কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়-নিরোধ করিবার চেষ্টা করে, তাহার প্রযত্ন যে নিষ্ফল হয় তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কাণ দ্বারা ইন্দ্রিয়

উত্তেজক কথা শুনা, চোখ দিয়া বিকারোৎপাদক বস্তু দেখা, জিহ্বা দ্বারা ইন্দ্রিয় উত্তেজক বস্তু খাওয়া, হাত দ্বারা বিকারোত্তেজক বস্তু স্পর্শ করা এবং সেই সময় কাম দমনের ইচ্ছা করা, আগুনে হাত রাখিয়া তাহা যেন না পোড়ে এরূপ আশা করার সমান। এজন্য যে ব্যক্তি কাম দমন করা স্থির করে, তাহার সকল ইন্দ্রিয় দমন করা দরকার। আমার সর্ব্বদা মনে হয় যে, ব্রহ্মচর্য্যের এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হইয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা এই যে, যদি এক সাথে সকল ইন্দ্রিয় দমন করার চেষ্টা করা যায়, তবে কাম দমনের চেষ্টা শীঘ্রই সফল হইতে পারে। স্বাদেন্দ্রিয় ইহাদের ভিতর মুখ্য। এজন্য স্বাদেন্দ্রিয়ের* কথা আমরা স্বতন্ত্র স্থানে আলোচনা করিয়াছি। তাহা পরে বলিব।

ব্রহ্মচর্য্যের মূল অর্থ সকলে যেন মনে রাখেন। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ—ব্রহ্মের অর্থাৎ সত্যের সন্ধানে চর্য্য অর্থাৎ চর্চ্চা বা আচরণ—অর্থাৎ সত্যাচরণ। এই মূল অর্থ হইতে ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমরূপ বিশেষ অর্থ বাহির হইয়াছে। এই অসম্পূর্ণ অর্থ আমাদের ভুলিয়া যাওয়া দরকার যে, ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ জননেন্দ্রিয় সংযম বা কাম দমন।

* এই আলোচনা তরুণ সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত গান্ধীজী লিখিত "সাধনার পথে" নামক পুস্তকে আছে—অনুবাদক

যারবেদা জেলে লিখিত গুজরাতী হইতে—আগষ্ট ৫, ১৯৩০